গৌর কথা

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের
অকৃপণ কৃপাধন্য
কান্তি পি. দত্ত

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)
[বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড]
কলিকাতা—১

প্রকাশক ঃ
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত
"রাজেন্দ্র লাইব্রেরী"
১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)
[বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড]
কলিকাতা-১

১ম সংস্করণ ১৯৫৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
"ভগবতী প্রেস"
১৪।১, ছিদামমুদী লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ—

যাঁর পরম করুণা আমাকে কৃষ্ণাভিমুখী তথা ঈশ্বরাভিমুখী

করে তুলবার জন্য সদা ক্রিয়াশীল—সেই

পরম শ্রদ্ধেয় করুণাময় বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শন

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য

গ্রন্থকার

Gour Katha
B·· · Kanti P. Dutta
F
I' মূল্য দশ টাকা

—ভূমিকা—

গৌরকথা কীর্ত্তন করতে পারি—তেমন যোগ্যতা আমার কই ? অসংখ্য গ্রন্থাদি পাঠ করেও কৃষ্ণতত্ত্ব বা গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিকরূপে অবহিত হওয়া অসম্ভব। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে জানা যায় না।

তিনি অব্যক্ত—কোন কিছুর দ্বারা তাঁকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আমরা আমাদের বুদ্ধি ও মনদ্বারাও তাঁর ধারে কাছেও যেতে পারি না। অদৃশ্য এবং অব্যক্ত হয়েও, তিনি যখন পরম করুণাবশে জীবকে দর্শন দান করেন—তখনই আমরা তাঁর দর্শনে ধন্য হ'তে পারি। কৃতকৃতার্থ হ'তে পারি। নইলে—তিনি আমাদের ধরা-ছোয়ার বাইরে। আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য। তিনিই সনাতন পুরুষ। তিনিই আদি পুরুষ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনিই একমাত্র পুরুষ। তিনিই পরম গতি। তিনি সর্ব্বেশ্বর। তিনিই পরমেশ্বর।

সেই পরম পুরুষ ভগবান সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, আমরা তাঁর মায়া দ্বারা আবদ্ধ—তাই দুঃখ আমাদের চিরন্তন। ঈশ্বর বিমুখতার জন্যই আমাদের দুঃখ, আমাদের অভাববোধ চিরন্তন। আমরা আমাদের সঠিক স্বরূপ সম্বন্ধে অনবহিত। আমরা মায়াবদ্ধ, আর ভগবান মায়াধীশ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে যখন কোন ভাগ্যবান জীব—ভগবানের প্রিয় কোন্ ব্যক্তির যাদৃচ্ছিকী কৃপা লাভ করে—তখনই তাঁর কৃপায় ধন্য হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করে।

আত্মজ্ঞান লাভের পরেই—সকল দুঃখ অপনোদিত হয়, সকল সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কর্ম্মাকর্ম্মের অবসান হয়। আমাদের হৃদয়গ্রন্থি ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টিতেই ছিন্ন হয়। জড়দেহ

তখন আর স্বীয় দেহরূপে প্রতীত হয় না। আমাদের জড়দেহ এবং ভাবদেহ হৃদয়গ্রন্থির মাধ্যমে সংযুক্ত, যতক্ষণ না সেই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়—ততক্ষণ পর্য্যন্ত জড়দেহকেই আমরা আমাদের আপন সত্বা বলে ভাবি। জড়দেহের সুখ-দুঃখকেই আমরা আপন আপন সুখ দুঃখ বলে অনুভব করি। কিন্তু ভগবানের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টিতে যখন হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়—তখন জড়দেহ থেকে আমাদের ভাবদেহ পৃথক হয়। জড়দেহ ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু ভাবদেহ অজর, অমর, অব্যয়। জড়দেহের বৃদ্ধি সাধনের জন্য যেমন চাল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যাদির প্রয়োজন, তেমনি ভাবদেহের পুষ্টি সাধনের জন্য ভগবানের কথা কীর্ত্তন, শ্রবণ ও লীলারস আস্বাদন প্রয়োজন। ভাবদেহের মাধ্যমেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব।

শ্রীশঙ্করাচার্য পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে বললেন—তিনি নির্গুণ। মায়া সম্বন্ধে বললেন—মায়া সৎও নয় আবার অসৎও নয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যুক্তিকে খণ্ডন করে বললেন—পরমব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি মায়াধীশ। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা; সর্ব্বেশ্বর এবং পরম পুরুষ।

ভগবানের মধ্যেই সমস্ত বিরুদ্ধে ধর্ম্মের সমন্বয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান বিধায়—তিনি নির্গুণ, আবার সগুণ। তিনিই নিরাকার এবং স্বেচ্ছাক্রমে সাকার। তিনি অব্যক্ত, আবার তিনি স্বেচ্ছাক্রমে ব্যক্ত।

শুধু সেখানেই থামলেন না শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বললেন—শ্রীকৃষ্ণই ভগবান স্বয়ং। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তিনি সর্ব্ব-নিয়ন্তা।

পরম করুণা ভরে শ্রীমন্মহাপ্রভু আরো বললেন—'জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস।

বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের জীবন ও বাণীর মধ্যে নূতনরূপে তুলে ধরলেন আমাদের কাছে।

"আপন সভারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

—চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ২৩ অঃ

কলিযুগের মানুষদের প্রতি পরম করুণাবশে তিনি মহামন্ত্র প্রদান করলেন। মায়াবদ্ধ জীবদের কাছে প্রাথমিক পর্য্যায়ে কৃষ্ণনাম রুচিকর নাও হ'তে পারে—কিন্তু অনুদিন ঐ নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ ও কীর্ত্তনে—নামে রুচি সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণ লীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজললনা তথা মহাভাবময়ী রাধার কাছে ঋণী হয়েছিলেন। 'যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেভাবেই ভজনা করি।'—গীতার মাধ্যমে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—ব্রজললনা, তথা মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভগবান সেই প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হন্‌নি। তাই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিকে স্বীকার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গৌররূপে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত কাশীধাম নিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু সম্বন্ধে বলেছেন—

অহো ন দুর্লভা মুক্তি ন চ ভক্তিঃ সুদুর্লভাঃ।
গৌরচন্দ্র প্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেহপি সুদুর্লভঃ॥

শুধু ঐখানেই তিনি ক্ষান্ত হ'লেন না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে লিখলেন ঃ—

অরে মূঢ়া গূঢ়াংবিচিনুং হরের্ভক্তি পদবীং,
দবীয়স্যা দৃষ্টাপ্যপরিচিত পূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ।
ন বিশ্রস্তশ্চিত্তে যদি যদি চ গৌল ভ্যমিবতৎ,
পরিত্যজ্য শেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণম্॥

ওরে মূঢ় মন, গূঢ় ও দূরবর্ত্তী অদৃষ্টবশতঃ মুনিজন কর্তৃক পূর্ব্বে অচিন্ত্য শ্রীহরির ভক্তিপথ অনুসন্ধান কর; এবং যদি সেই দুর্লভ বস্তু কিরূপে লাভকরা সম্ভব এরূপ সংশয় জাগে—

সবকিছু ত্যাগ করে শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লও।

জীবের প্রতি পরম করুণাবশে অব্যক্ত সেই ভগবান তাঁর অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে গৌররূপে অবতীর্ণ।

"অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌর॥"

অন্তরে যিনি কৃষ্ণ, বাহিরে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ।

"পঞ্চতত্ত্বাকঃ কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁর রূপ, শ্রীমন্নিত্যানন্দ যাঁর স্বরূপ, শ্রীমদদ্বৈত রূপে যিনি ভক্তাবতার, শুদ্ধ-ভক্ত শ্রীবাসাদি রূপে যিনি ভক্তাখ্য এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীগদাধর আদি রূপে যিনি ভক্তশক্তি—আমি সেই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

এবং আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি—তাঁর অসীম করুণাতেই গৌর-কথা সার্থকরূপে রচনা করা সম্ভব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকরদের জন্য রসরাজ উপাসনার প্রবর্ত্তন করলেও, সাধারণ মানুষের জন্য হরিনাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। জাতি ও সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ধ্বংস করে জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকেই তিনি পরমার্থের অধিকার দিয়েছেন। তাঁর এই এই দয়ার তুলনা বিরল।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥
যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম চণ্ডাল॥
ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
করিবেক সম্মান বহু মান্য করি॥"

যিনি স্ত্রী আদি অধম চণ্ডালদেরও পরম করুণাবশে পরমার্থের অধিকার দিয়েছেন, আমার মতো অধমও তাই তাঁর পরম করুণার ওপর ভরসা করেই গৌরকথা কীর্ত্তনে ব্রতী হয়েছি। গৌর-কথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে আমি সকল বৈষ্ণবের চরণে প্রণতি জানাই।

কান্তি পি. দত্ত

গৌরকথা

প্রথম অধ্যায়

গৌরাঙ্গবতার সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা বললেন গৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবাস ঃ—

অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥
লুকাও আপনে তুমি প্রকাশ আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে ॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত অ: ৯ অ

ভগবান অব্যক্ত ও অব্যয়—কোন কিছু দ্বারাই তাঁকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান। তিনি নিরাকার, আবার স্বেচ্ছাক্রমেই সাকার। তিনি নির্গুণ আবার স্বেচ্ছাক্রমে সগুণ। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ—তিনিই সব। তাঁর মধ্যেই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়।

একটা মাটির ঢেলাকে জানলে যেমন মাটির তৈরী সবকিছুকে জানা যায়, সোনাকে জানলে যেমন সোনার তৈরী সবকিছুকে জানা যায়—তেমনি একমাত্র ভগবানকে জানলেই—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুকে জানা যায়। তিনিই পরমতত্ত্ব। বেদ উপনিষদের প্রতিপাদ্য। তিনি মায়াধীশ, আর আমরা মায়াধীন।

আমরা নিজেদের প্রকৃত সত্বা সম্বন্ধে অনবহিত, ঈশ্বর বিমুখ—পরম প্রেমময় ভগবানকে আমরা বিস্মৃত—তাই দুঃখ আমাদের চিরন্তন। আমরা অপূর্ণ, ভগবান পূর্ণ। তাই ভগবানের দরবারে আমরা কেবল প্রার্থী। তাঁকে ভালবাসি না আমরা।

আমরা যতই ঈশ্বর বিমুখ হয়ে আমাদের শক্তি সামর্থের বড়াই করি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোন সামর্থ্যই নেই।

বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে কল-কারখানা চলছে: ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে—কিন্তু কারেণ্ট অফ্ হয়ে গেলে সব ঠাণ্ডা। ঠিক তেমনি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের মায়াশক্তি প্রভাবেই আমরা পরিচালিত—আমরা নিরপেক্ষভাবে কোন কিছুই করতে সমর্থ নই।

আমরা বলি—আমরা নাকি বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছি—এবং ভগবানকে চ্যালেঞ্জ করার পর্য্যায়ে প্রায় পৌঁছে গেছি—কিন্তু আমরা কোন Basic thing আজ পর্য্যন্ত তৈরী করতে পেরেছি কি? —একটা দুর্ব্বাঘাস, একটা লতা—একটা ছোট্ট পোকা। না, কোন Basic thing আজ পর্য্যন্ত আমরা তৈরী করতে পারিনি। যা ছিল, তাই ভেঙে-চুরে মিশ্রণ করে—নূতন কিছুর রূপ দিয়েছি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরা আজ পর্য্যন্ত কোন Basic thing তৈরী করতে সমর্থ হইনি। অতএব আমরা যতই বড়াই করি, আমাদের দৌড় একটা বিশেষ সীমা পর্য্যন্তই। সীমার বাইরে যেতে পারি না আমরা—সীমার প্রান্তে গিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়ি।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর মোটেই জড়পদার্থ নন—তাঁর Calculating brain রয়েছে—নইলে এত অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে এত বৈচিত্র্য কিরূপে বিদ্যমান? সৃষ্টিই বা এত নিখুঁত কেন?

বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্য বলেন ক্রমবিবর্ত্তনের ফলেই—সৃষ্টি ক্রমশঃ সুন্দর হয়েছে,—কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ যাই বলুন, স্রষ্টা যদি না থাকেন এবং সেই স্রষ্টার যদি সৌন্দর্য্যবোধ না থাকে—কেবলমাত্র ক্রম বিবর্ত্তনের ফলেই কি সৃষ্টির এই সৌন্দর্য্য বিধান সম্ভব?

স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টিকে ক্রমশঃ সুন্দর করে তুলেছেন। তাই দেখে দেখে আর নয়ন ফেরান যায় না।

যাঁর সৃষ্টি এত সুন্দর, তিনি না জানি কত সুন্দর!

বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান রয়েছেন, তাঁকে আমরা প্রত্যক্ষ করি বা না করি তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করি কিরূপে? একটা সাধারণ স্বয়ংক্রিয় কারখানার কার্য্যধারা পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য যদি একজন মানুষ পর্য্যবেক্ষকের প্রয়োজন হয়, তবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন, ধ্বংস ইত্যাদি কার্য্যধারা পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান থাকা কি একেবারেই অস্বাভাবিক?

বরং তাঁর বিদ্যমানতাই স্বাভাবিক। কেউ বলছেন তিনি নিরাকার, অব্যক্ত, নির্গুণ,—কেউ বলছেন তিনি সাকার, সগুণ ও ব্যক্ত। আমি বলি—তিনি সব। একমাত্র তাঁরই মধ্যে সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত—তাই তিনি ভগবান।

অব্যক্ত ও নির্গুণ পরমব্রহ্মকে চিন্তা করাও অসম্ভব। শাস্ত্রমাত্রেই শব্দাত্মক। নির্গুণ পরমব্রহ্মকে নিয়ে কোন আলোচনা করাই সম্ভব নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগামীরা তাই বললেন—তিনি সগুণ। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি মায়াধীশ। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বললেন—শ্রীকৃষ্ণই সেই পরমব্রহ্ম। তিনিই ভগবান স্বয়ং। অংশ নন্, অংশাবশেষ অবতারও নন—পূর্ণাবতার। তাঁকেই ভজনা কর। তিনিই বেদ-উপনিষদের প্রতিপাদ্য। তিনিই পরমগতি। তিনিই পরম পুরুষ।

ওখানেই ক্ষান্ত হ'লেন না তিনি। তিনি আরও বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তির বশ। তিনি অচ্যুত। ভক্ত হৃদয়ের সঙ্গে তিনি সর্বদা সংযুক্ত। শান্ত-দাস্য সখ্য, বাৎসল্য বা মধুরভাবে সেই পরম প্রেমময়।

শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করলে—মুক্তিকেও তুচ্ছ মনে হবে। জীবের প্রকৃত স্বরূপ—'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।' কৃষ্ণ বিমুখতাই জীবের চিরন্তন দুঃখের কারণ।

মানুষের দেহ দুর্ল্লভ। কিন্তু দেহধারী ব্যক্তি বা বস্তুমাত্রেই ক্ষণ ভঙ্গুর,—তবুও অন্য পশুপাখি অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষের

মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্যমান। যদিও সেই বুদ্ধিবৃত্তি মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন —তবু অন্যান্য পশুপাখি অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ। এবং তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে এবং আমরা যদি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি— আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মনুষ্যদেহ দুর্লভ। কিন্তু তদাপেক্ষা দুর্লভ ভগবানের প্রিয়জনের দর্শন লাভ। অর্থাৎ ভগবানের যিনি প্রিয় তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ। কারণ একমাত্র ভগবানের প্রিয়জনের কৃপা-দৃষ্টিতেই ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়! কেবলমাত্র পুস্তক বা গ্রন্থাদি পাঠ করে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথরূপে অবহিত হওয়া অসম্ভব।

ভগবানের আপনজন ছাড়া ভগবানকে যথাযথরূপে চিনিয়ে দেওয়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বোঝার নামে—আমরা শুধু পাণ্ডিত্যের বোঝাই বহন করি কেবল। কিন্তু তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে জানা সম্ভব নয়। বহুবিধ গ্রন্থপাঠ করে গ্রন্থকীট হওয়া যায় কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় না।

মহাপ্রভু তাই স্পষ্ট কণ্ঠেই বললেন: "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।"

সাধু-সঙ্গের ফলেই কৃষ্ণভক্তি সঞ্জাত হয়। কারণ সাধু-তথা ভক্ত বৈষ্ণবগণই শ্রীকৃষ্ণের আপন জন। তাঁদের কৃপার মাধ্যমেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ সম্ভব।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ॥"

ভক্তি লতাবীজ লাভ করা সহজসাধ্য নয়। যদৃচ্ছিকী কৃপার ফলেই কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তি লাভ সম্ভব।

কিন্তু কেবা প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব, সাধারণ জীবের জানা সম্ভব নয়, আমাদের সাধারণ বিচারে যাকে আমরা ভণ্ড ভাবি—হয়তো তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বা সাধু। অতএব সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাউকেই অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়, যদি কারো প্রতি শ্রদ্ধা

না জাগে—তবে তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া সঙ্গত, কিন্তু কোন বৈষ্ণব বা সাধুকে আঘাত করা অসঙ্গত, অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বা অপমান করা অপরাধজনক। ভগবানের কোন ভক্তের হৃদয়ে আঘাত হানলে—তাঁরই হৃদয়ের ঠাকুরকেই আঘাত হানা হয়। তাই বৈষ্ণবাপরাধ এক মারাত্মক অপরাধ বিশেষ।

বৈষ্ণবের বহুবিধ লক্ষণ সবার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, কিন্তু নিরন্তর কৃষ্ণনাম যার মুখে উচ্চারিত, যাঁর দর্শনে কৃষ্ণনাম মুখে আসে। অর্থাৎ যাঁর দর্শনে—ভগবানের কথা মনে হয়, ভগবানের নাম উচ্চারণ করার জন্য হৃদয় আকুল হয়, যাঁকে দেখলে ভগবানের কথা মনে হয়- তিনি যে বেশেই থাকুন, বাইরে তাঁর যেরূপ আচরণই প্রকাশ পাক, তাঁকেই তাঁর প্রতি বৈষ্ণব বা সাধুজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান হ'তে হবে।

"নিরন্তর কৃষ্ণনাম যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণবের দর্শন মহা ভাগ্যগুণেই লাভ হয়।

"ধর্ম্মাচার মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

—চৈতন্য চরিতামৃত

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তাঁর মনে কোন কামনা থাকে না—একমাত্র কামনা শুধু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করা। ভোগী, মুক্তিকামী, সিদ্ধিকামী—তাঁরা কেউ নিষ্কাম নন — পূর্ণ নন। অভাববোধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে — ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা পূর্ণ নন। কৃষ্ণ-

ভক্ত মাত্রেই নিষ্কাম, অভাব বোধহীন, তাই তাঁরা সবাই পূর্ণ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণতা না আসে — নিষ্কাম প্রেম সম্ভব নয়। আমরা ভালবাসি বটে, এবং জাগতিক ভালবাসা যতই উচ্চাঙ্গের হোক—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা সেই ভালবাসার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে বিজড়িত থাকে। তাই ভালবেসেও আমরা সুখ পাই না। অভাববোধের তাড়নায়—ভালবাসার পাত্র-পাত্রীর কাছ থেকে কোন না কোন ভাবে প্রতিদান কামনা করি। প্রতিদান না পেলে দেহ-মনে তীব্র দাহের সৃষ্টি হয়।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের দেহ ও শ্রীকৃষ্ণ অভেদ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ।

হ্লাদিনীর মাধ্যমেই প্রেমের বিকাশ। এবং কৃষ্ণপ্রেমের চরম ও পরম অবস্থা মধুর ভাবেতে বিদ্যমান।

"সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥"

*　　*　　*

"প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগু কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগু কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগু কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য আর॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগু কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগু কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥

প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগু আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগু কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভূ কহে ইহোত্তম আগু কহ আর।
রায় কহে কান্ত ভাব প্রেম সাধ্য সার॥"

মহাপ্রভু ও বিদ্যানগরের রামানন্দ রায়ের কথোপকথনের মাধ্যমেও কান্তভাব বা মধুরভাবই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত।

মুক্তি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করা শ্রেষ্ঠ। তদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানশূন্য ভক্তি। জ্ঞান-শূন্য ভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ। আবার প্রেম-ভক্তি অপেক্ষা দাস্য-প্রেম শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভূও দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছেন—

"মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধদাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥

"মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাব্জে।"

—মুকুন্দমালা স্তোত্র।

ভক্ত অন্য সঙ্গ কামনা করে না, কারণ তাতে ইতর স্মৃতি জাগরিত হয়। ভক্তিতে আস্থাহীন মুমুক্ষুর সঙ্গও ভক্তগণের পক্ষে বর্জ্জনীয়।

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস যত্র বিলুপ্যতে।।

—হনুমদ্বাক্যম্।

হে প্রভো, ভববন্ধনমোচনকারী! তোমার কাছে আমি মুক্তি প্রার্থনা করি না। কারণ ঐরূপ প্রার্থনায় 'তুমি প্রভু, আমি দাস'—এই সম্বন্ধ লোপ পায়।

জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥

তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা॥

—চৈতন্য ভাগবতম্ ১০ অঃ

দাস্য প্রেম অপেক্ষা সখ্য-প্রেম শ্রেষ্ঠ।

শান্তরসে শান্তরতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি 'রাগ' পর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥
সখ্য—বাৎসল্য - রতি পায় 'অনুরাগ' সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥

সখ্য প্রেমের থেকে শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য প্রেম, এবং বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কান্ত বা মধুর ভাব—প্রেমের চরমোৎকর্ষতা মধুরভাবেই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

আমাদের জাগতিক অভিধানে প্রেম শব্দটি আছে মাত্র, কিন্তু প্রেমধন ছিল চির অনর্পিত, পৃথিবীতে অনর্পিত। সেই প্রেমধনের জীবন্তমূর্ত্তি একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা যুক্ত পরম প্রেমের তুলনা কোথায়? রাধার ভাব ও কান্তি স্বীকার করে মহাপ্রভুই সে প্রেমের অমৃতময় বার্তা শোনালেন। নইলে ঐ প্রেমের কথা আমরা কি করে জানতুম? নৃলোকে, দেবলোকে এবং সত্যাদি কোন লোক, এমন কি পরব্যোমে এবং মথুরা বা দ্বারকায়ও এ প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজবধুগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
পৌঢ় নির্ম্মলভাবে প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস—আস্বাদ কারণ॥
অতএব সেইভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

শ্রীরাধার মতো আর কেউ তেমন করে বলতে পারেন নি—

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'
কানের ভিতর দিয়া / মরমে পশিল গো / আকুল
করিল মোর প্রাণ।'
'পিরীতি বলিয়া / এ তিন আখর /
ভুবনে আনিল কে।

প্রেম বা পীরিতি—এই শব্দটির সার্থক বিকাশ তাই ব্রজললনা তথা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমে। মন্মহাপ্রভু সেই প্রেমেরই জীবন্তমূর্ত্তি হয়ে ধরণীতে আবির্ভূত হয়েছেন।

আত্মারাম, স্বাধীন ও স্বরাট শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমে পরাজিত, অনন্ত ঋণ ভারে ঋণী। মুনিজন এবং দেবগণ যাঁর চরণ কমল বন্দনা করেন, সেই স্বাধীন স্বরাট ও আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের মনোভাবকে সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন কবি জয়দেব।

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লব মুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতং বিকারম্॥

হে প্রিয়তমা।, তোমার রমনীয় পদপল্লব ভূষণ স্বরূপ আমার মস্তকে অর্পণ কর, তাতে কেবল যে আমার মস্তকের শোভা বৃদ্ধি পাবে তা নয়, যে অনঙ্গরূপ গরল আমাকে বিষ-জ্বালায় দগ্ধ করছে—তা'রও খণ্ডন হবে।

মদন জ্বালা রূপ নিদারুণ অগ্নি আমাকে দগ্ধ করছে, চরণ স্পর্শে দেহজনিত বিকার বিদূরিত হোক।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে মহাভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বরণের পূর্বে ব্রজে গিয়েছিলেন। ব্রজললনাগণ উদ্ধবের পরিচয় জানতে পারলেন এবং যখন জানলেন শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হয়েই বৃন্দাবনে এসেছেন।—তখন ব্রজললনাগণ একান্তে কৃষ্ণলীলা সমূহ স্মরণ করে বিলজ্জভাবে রোদন করতে লাগলেন। মহাভাবময়ী শ্রীরাধা ভ্রমর গীতায় কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করলেন। উদ্ধব ব্রজললনা-

গণকে নানাবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। এবং গোপীগণের অনুরোধে শ্রীউদ্ধব তিনমাস বৃন্দাবনে অবস্থান করলেন।

ভক্ত উদ্ধব কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী ব্রজললনাগণের কৃপাভাজন হ'লেন। গোপীগণ কৃপা পরবশ হয়ে উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণানুরাগের যে অচিন্ত্য ও অশ্রুত ভাবাবলী প্রদর্শন করেছিলেন, কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত উদ্ধব ব্রজলালনাদের অনুগ্রহে ধন্য হয়ে—ঐ অচিন্ত্য প্রেমানুরাগের গ্রাহক হয়ে বলেছিলেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো।
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ় ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয় বয়ঞ্চ।
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত কথাসারস্য॥ —ভাঃ ১০।৪৭।৫৮

নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজগোপীগণের অনন্যগত প্রেম বিদ্যমান থাকায় তাঁরাই কেবলমাত্র সার্থক জন্ম লাভ করেছেন। ভবভীত মুমুক্ষু মুনিগণ এবং আমার মত ভক্তগণ ঐরূপ প্রেম প্রার্থনা করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকথা রসিক ব্যক্তিগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ জন্মে অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মেই বা কি? যে কোন জন্মে জন্মলাভ করলেও গোপীগণই সর্ব্বোত্তম।

উদ্ধব শুধুমাত্র ব্রজগোপীগণের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁদের শ্রীচরণরেণুর প্রার্থী হয়ে বললেন,—

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চহিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

যারা দুস্ত্যজ্য পতি-পুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতি সমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ পদবীর অনুসন্ধান করেছেন, আহা, আমি বৃন্দাবনে সেই ব্রজললনাগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্মলাভ করে ধন্য হ'বো।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ॥
যবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।
সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যে তাঁ'রে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

একমাত্র রাগানুরাগী ভজনকারী বৈষ্ণবগণ ভাবদেহে সখীরূপে কৃষ্ণের ভজনায় সমর্থ—সখীরূপে রসরাজের ভজনা সাধারণের অসাধ্য।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুদথ বর্ণয়েদ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং,
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।

—ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

যিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ব্রজবধূগণসহ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন বা শ্রবণ করেন বা ব্যক্ত করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে পরা-ভক্তি লাভ করে হৃদরোগরূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করতে সমর্থ হন্। এ সম্পর্কে চরিতামৃতেও উল্লেখ রয়েছে—

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্রোগ কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে—মহাধীর হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥

—চরিতামৃত অঃ ৫ পঃ

শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণের প্রসঙ্গে বলেছেন—

"রামেন সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা মর্য্যনুরক্ত চিত্তাঃ।
বিগাঢ় ভাবেন ন মে বিয়োগ—
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায়॥"

অক্রুর বলরাম সহ আমাকে মথুরায় নিয়ে গেলে—আমাতে অতি দৃঢ়ভাবে অনুরক্তচিত্তা গোপীগণ তখন আমার বিরহজনিত তীব্র ও দুঃসহ মনস্তাপে তপ্ত হয়ে কেবলমাত্র আমার সমাগম ব্যতীত অন্য-কোন বস্তুকেই সুখকররূপে দর্শন করেন নাই।

ব্রজবধূগণের কৃষ্ণসঙ্গে কল্পকাল ক্ষণার্দ্ধবৎ এবং কৃষ্ণ বিরহে ক্ষণার্দ্ধ-কালও কল্পসম প্রতীত হয়েছিল—

ব্রহ্মরাত্রিততরিপ্যঘশত্রো
সা ক্ষণার্দ্ধবদগাত্তর সঙ্গে।
হা ক্ষণার্দ্ধমপি বল্লবিকানাং,
ব্রহ্মরাত্রিতবদ্বিরহেঽভূৎ।

গোপীগণ বললেন—হে অঘনাশন! রাসস্থলীতে তোমার মিলন কালে বান্ধবীগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মরাত্রি সকলও ক্ষণার্দ্ধতূল্য গত হয়েছিল। হায়! এখন তোমার বিরহে ঐ বল্লবীবৃন্দের ক্ষণার্দ্ধকালও ব্রহ্মরাত্রি সমূহের ন্যায় সুদীর্ঘ প্রতীত হচ্ছে।

অক্রুর দর্শনের পর গোপীগণ পারস্পরিক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র
লীলাবলোক পরিরম্ভণ রাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনাতং।
গোপ্যঃ কথংন্বতিতরেম্ তমো দুরন্তম্॥

—ভাঃ ১০।৩৯।২৯

হে সখিগণ,—যে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ মধুর হাস্য, লীলাসহ দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনযুক্ত রাগ সভায় আমি রাত্রি সকলকে ক্ষণকালের

স্থায় অতিবাহিত করেছি, সম্প্রতি তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) অভাবে এই দুস্পার বিরহ দুঃখ কিরূপে উত্তীর্ণ হবো।

গোচারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করতেন, তখনও কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলা গোপীগণের কাছে ক্ষণকাল মাত্র সময়ও যুগসম প্রতীত হ'তো—

"অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটী যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্॥"

—ভাঃ ১০।৩১।১৫

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে প্রিয়তম, যখন তুমি দিবাভাগে ব্রজবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখে ক্ষণকালও আমাদের কাছে একযুগ বলে মনে হয়।

লোকদ্বয়ের ধর্ম্মবিহারে গোপীগণের কৃষ্ণভজন রীতির তুলনা বিরল।

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

* * *

দুস্ত্যজ আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করেও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য সদা সচেষ্ট।

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম।
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন।
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম সেবন॥ —চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, লজ্জা, দেহসুখ, সংসার ধর্ম, আপন পরিজন—সকল কিছু পরিত্যাগ করে ব্রজবধূগণ অনন্য চিত্তে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির কারণে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিতা সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥

—ভাঃ ১০।২৯।৫-৭

তাঁদের মধ্যে (গোপীগণের মধ্যে) কেউ কেউ দুগ্ধ দোহন করছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের আহ্বান (কৃষ্ণগীত বা বংশীধ্বনি) শ্রবণে সমুৎসুক হয়ে যাত্রা করলেন। কেউ চুল্লীর ওপরে দুগ্ধ, কেউ বা চুল্লীস্থিত অন্ন না নামিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন। কোন কোন ব্রজবালা খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করছিলেন, কেউ বা শিশুকে স্তন্য প্রদান করছিলেন, কেউ স্বামীসেবা, কেউ ভোজন, কেউ অঙ্গরাগ, কেউ বা শরীর মার্জ্জন এবং কেউ কেউ বা নয়নদ্বয়ে অঞ্জন প্রদান করছিলেন। তাঁরা তখন নিজ নিজ কার্য্যাদি অসমাপ্ত রেখেই বিপরীত ভাবে বসনভূষণাদি ধারণ করে আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

অতএব ব্রজললনাগণের কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা কোথায়? স্বরাট, স্বাধীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং মুনিগণার্যক হয়েও, এবং তিনি স্বয়ং সর্ব্বসুখে পরিপূর্ণ হয়েও স্বসুখার্থে ব্রজবালাগণের সঙ্গে রমণে নিরত হয়েছিলেন।

ব্রজললনাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত-হ্লাদিনী শক্তি বিধায় তাঁরা তাঁরই আত্মভূত; সুতরাং তাঁদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রমণ একান্ত ভাবেই স্বাভাবিক। ভগবানের নিজাত্মা অপেক্ষা ভক্তগণই তাঁর নিকট অধিক আনন্দপ্রদ। ব্রজললনাগণ সর্ব্বভক্ত শিরোমণি বিধায় আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আনন্দ প্রাপ্তির কারণেই তাঁদের সঙ্গে রমণ করেছিলেন।

"তামেব পরমাত্মানাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।"—ভাঃ ১০।২৯।১১

পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন—গোপীগণ জারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েও পরমাত্মা শ্রীহরির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

গোপীগণ মাধুর্য্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই একান্তভাবে জানতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণকে জানতেন না।

"গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্য না জানয়॥
শ্যামসুন্দর, শিখিপুচ্ছ—গুঞ্জাবিভূষণ।
গোপবেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন॥
ইহা ছাড়ি, কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ

গোপীগণ অনন্যচিত্তে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণেতেই আসক্ত ছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ লক্ষ্মীর মনহরণ করতে সমর্থ হ'লেও—গোপীগণের মন হরণে সমর্থ হন নি। কারণ গোপীগণ একান্ত ভাবেই কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই জানতেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বিলাসমূর্ত্তি তাঁদের কাছে প্রীতিপ্রদ ছিল না।

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাংকৃতী।
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্॥
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন ভুজৈর্জিষ্ণুভি।
যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

— ললিতমাধব ৬ অঃ ১৩ শ্লোঃ

কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক ভরে অদ্ভুত রুচিযুক্ত নারায়ণ মূর্ত্তি প্রকট করলে—গোপীগণের রাগোদয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। অতএব ব্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্য ভজনশীল দুর্গম পারকীয় পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন পণ্ডিত উপলব্ধি করতে সমর্থ?

গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে এতই আত্মহারা যে, তাঁরা স্বদেহস্মৃতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়ে পড়তেন। তবু যে কোন কোন সময় তাঁরা স্বদেহে মার্জ্জন

বা ভূষণাদি ধারণ করতেন—তা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য।

'তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহ প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ

গোপীগণের স্বরূপ সাধারণের দুরধিগম্য। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী-শক্তি সম্ভূতা।

এবং পরিষঙ্গ করাভিমর্শ—
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাস-হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি—
র্যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব—বিভ্রমঃ॥ —ভাঃ ১০।৩৩।১৬

শ্রীশুকদেব বললেন—বালক যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্বের সঙ্গে ক্রীড়া করে, সেরূপ লক্ষ্মীর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, উদ্দাম বিলাস ও হাস্যসহকারে ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলেন।

গোপীগণ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

সহায়া গুরুবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তিন॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

—আদিপুরাণ

হে পার্থ, গোপীগণ আমার সর্ব্বস্ব। তাঁরা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, তাঁরা উপভোগ যোগ্যাও বটেন, বন্ধুর ন্যায় তাঁরা প্রেমাচরণ করেন এবং

বিবাহিত স্বরূপ ব্যবহার করেন। আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা—আমার মনের ভাব কেবলমাত্র গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ তথ্য আর কেউ জানে না।

'কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী ॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি, ইষ্ট সমীহিত ॥
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা।'

—চৈঃ চঃ আঃ ৪ আঃ

রাধা সহ কৃষ্ণের যতেক ক্রীড়া, রসবৃদ্ধির কারণে সংঘটিত—অন্যান্য গোপীগণ রসোপকরণ মাত্র।

"সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।"

—পদ্মপুরাণ

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা। কারণ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি সম্ভূতা। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র ব্রজবাসীগণই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—ভক্তদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥

রাধা ও কৃষ্ণের সম্বন্ধও তাই অনবদ্য, প্রেমের মাধুর্যে মহামণ্ডিত।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥

হ্লাদিনীর মাধ্যমেই কৃষ্ণ আপন ভক্তদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, পোষণ করেন। হ্লাদিনীর সার 'প্রেম' তথা প্রেমসার 'ভাব', ভাবের পরম পরাকাষ্ঠা মহাভাবে, তাই শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপা।

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥
শক্তিমান্ ও শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ –

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করে মানি ॥
সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার 'প্রেম' প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব' ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥

* * *

কৃষ্ণ প্রেমভাবিত যাঁর চিতেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার ॥

কৃষ্ণপ্রেমের মহাভাবে ভাবিত শ্রীরাধার চিতেন্দ্রিয়-কায়। তাই শ্রীরাধাই বলতে পারেন—'তাঁর প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে / প্রতি অঙ্গ মোর।'

অন্যান্য ব্রজললনাগণ সম্বন্ধেও চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে—

আকার—স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ – চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ

গোপীভাব এবং গোপীতত্ত্ব সাধারণের দুরধিগম্য তত্ত্ব। পরম করুণাময়ের পরম করুণা ছাড়া এ তত্ত্ব সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ দুঃসাধ্য।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেম ভাজনম্ ॥ —আদিপুরাণ

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন—হে পার্থ, গোপীগণ তাঁদের নিজ নিজ শরীর আমার ভোগ্য বলেই তাতে যত্ন প্রকাশ করেন, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেউ নেই।

গোপীগণের কৃষ্ণ-প্রেমের কথা যখন শ্রীউদ্ধব গোপনে শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষীগণের কাছে নিবেদন করেছিলেন, সেকথা শুনে পট্টমহিষী-গণ প্রেমপ্রলুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যাং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্।।
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ।।
ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছান্তি পুলিন্দ্যস্তৃণ বীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ।।

—ভাঃ ১০।৮৩।৪১-৪৩

গোপীগণ তথা মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমে চিরবদ্ধ হয়েছেন স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ। কেবল বদ্ধ বললে কম বলা হয়—ঋণী হয়ে রইলেন তিনি।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' — গীতা

কিন্তু গোপীগণ তথা মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব হয় নি।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।।
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ—শ্রীমুখ বচনে।।

— চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৭৭-৭৯

প্রেমময়ী মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার যে প্রেমের কাছে জগৎ-মোহন শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত। শ্রীরাধার যে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী-মোহন হয়েছেন সেই প্রেমের পাত্রীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহ—শৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা"। —ভাঃ ১০।৩২।২২

আমার সঙ্গে তোমাদের যে সংযোগ তা' বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করে আমার ভজনা করেছ, আমি দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হ'লেও প্রত্যুপকার সাধনে সমর্থ হবো না, অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্য দ্বারা প্রত্যুপকৃত হ'ও।

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল বিনা দ্বিধায়। শ্রীকৃষ্ণলীলায় স্বরাট ও স্বাধীন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাছে ঋণী হয়েছিলেন।

ঋণ স্বীকার করেও নিত্যতৃপ্ত ভগবান পরিতৃপ্ত হ'তে পারেন নি। পরিতৃপ্ত হ'তে পারেন নি বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে ভাব ও বর্ণে শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি স্বীকার করে আবির্ভূত হ'তে হ'ল তাঁকে। গীতায় উক্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই আবার আসতে হ'ল তাঁকে। অন্তরে ও বাইরে প্রেমময়ী শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম তন্ময়তায় বিভাবিত কৃষ্ণ, স্বয়ং প্রেমাস্বাদনে উন্মত্ত হয়ে সেই প্রেম-পসরার ডালি ভক্তজনের কাছে অকাতরে বিতরণ করলেন।

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।
নিজ প্রেম আস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই স্বীকার করলেন যে তিনি রাধার প্রেমে বিহ্বল।

সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়।'
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥

বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি' উপায় ॥

* * *

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা—আচরণ দ্বারে ॥
রাধা-ভাব অঙ্গী করি, ধরি, তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥

—চৈতন্য চরিতামৃত ৪র্থ পঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবানের আবির্ভাবের কারণ চৈতন্য চরিতামৃতের উপরোক্ত শ্লোকে বিশদভাবে বর্ণিত।

"বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধা।

"বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধা। আস্বাদনের চমৎকারিতাই, মহারস ও রস সম্ভোগের চরম পরিণতিই নদীয়া বিনোদিয়া শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর। রস-ব্রহ্মের আনুভূতি আজ প্রকটিত ধরণীর ধূলিতে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

গীতায় উক্ত আপন প্রতিশ্রুতি পালনের নিমিত্ত, অন্তরঙ্গ পরিকর-গণের জন্য রসরাজ উপাসনার প্রবর্ত্তনের জন্য, জাতি-ধর্ম্ম—পাপী-তাপী নির্বিশেষে সকল মানুষকে পরমার্থের অধিকার প্রদানের জন্য—ভূমা নেমে এলেন ভূমিতে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের প্রভাব ব্যাপকভাবে যখন বিস্তারিত, কৃষ্ণতত্ত্বে যখন বিস্মৃতির অন্ধকারে প্রায় অবলুপ্ত—প্রেমের ঠাকুর করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ ধরণীতে আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণতত্ত্বকে যথাযথভাবে তুলে ধরলেন। ভূমার ভূমিতে আবির্ভাব নিশ্চয়ই এক অঘটন—কিন্তু ইতিহাসই সে অঘটনের সাক্ষী।

যুগ যুগান্ত ধরে মানুষ পরম পুরুষ ভগবানের সন্ধানে লিপ্ত, সেই পরম পুরুষই করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে মানুষের সন্ধানে নেমে এলেন ধরণীর ধূলিতে। এ এক পরমাশ্চর্য। এর চেয়ে আর কোন পরমাশ্চর্য্যের কথা সকল শাস্ত্রানুশীলনেও পাওয়া সম্ভব নয়। মানুষ এতকাল ভগবানের জন্য কেঁদেছে। প্রেমের ঠাকুর করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মানুষের জন্য কাঁদলেন।

'উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।'

মানুষ অপূর্ণ, চিরন্তন অভাবগ্রস্ত। অনাদিকালের ভগবদ্—বিস্মৃতির ফলেই মানুষ চির অভাবগ্রস্ত। ভগবান্ পূর্ণ-পুরুষ। যতক্ষণ না মানুষ তাঁর সংস্পর্শে আসছে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের পক্ষে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের অভাববোধ দূর হ'তে পারে না।

করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ মহাপ্রভু ধরণীতে এসে করুণাভরে বললেন—প্রেমেই পূর্ণতা। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেম তথা ভগবদ্-প্রেমই সার।

চিরকালের অভাবগ্রস্ত মানুষকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পরম করুণায় কৃষ্ণপ্রেমের মহাধনে ধনী করে দিলেন।

রাধাভাবদ্যুতি অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এলেন নদীয়ায়। অন্তরঙ্গ পরিকরগণের জন্য রসরাজ উপাসনার প্রবর্ত্তন করলেন—কলিযুগের সাধারণ মানুষের জন্য পরম করুণাভরে হরিনাম প্রবর্ত্তন করে পরমার্থের সন্ধান দিলেন। নাম-প্রেমের মালা গেঁথে জীবের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

'নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার।' এ করুণার তুলনা নেই!

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। এক অঘটন।

ধর্ম্মকলহে বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক তর্ক দ্বারা বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধির

দ্বারা পরিচালিত জগতকে সকল বর্ণ, পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, উপেক্ষিত, অবহেলিত আর্ত্ত ও চির অভাবগ্রস্ত মানব সমাজকে এক সাম্য, সেবা ও প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করার জন্যই মহাপ্রভু নেমে এসেছিলেন ধরণীর ধূলিতে।

গৌরকথা স্মরণ মাত্রেই জন্ম মৃত্যু আদি দ্বারা দুঃখ-উদ্বেল, সংসার যন্ত্রণার দ্বারা সতত ব্যাকুল হৃদয়ের প্রীতিহীনতা, শুষ্কতা ও অতি-কাঠিন্যযুক্ত ভাবের মধ্যেও চিত্তের আর্দ্রতা ও কোমলতা সঞ্জাত হয়।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ধর্ম্মকে গ্লানিমুক্ত করে, নানা মতবাদের বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করে নব যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

ধর্ম্মকলহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক তর্ক দ্বারা বিভ্রান্ত, আত্মঘাতিনী ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত তৎকালীন দুর্ব্বল ও শক্তিহীন বাঙালী জাতিকে—শ্রীমন্মহাপ্রভুই সেদিন সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে মানবতার ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ পরিকরগণের জন্য পরম মাধুর্য্যময় রসরাজ উপাসনার প্রবর্ত্তন করেছিলেন—কিন্তু সাধারণ মানুষকেও কৃপাসমুদ্রস্বরূপ সেই সনাতন পুরুষ বঞ্চিত করেন নি। পরম করুণায় কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে পরমার্থের সন্ধান দিয়েছিলেন।

কলিসন্তরণোপনিষদেও দেখা যায় যে—

—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকলুষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥'

হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী। এর থেকে শ্রেষ্ঠ উপায়ের কথা সর্ব্ববেদের মধ্যেও নেই।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাই বললেন—

কৃষ্ণ ভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণনাম-গুণ বই না বলিহ আর॥

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৭৪-৭৮

অবশ্য সাধারণ জীবগণের কাছে প্রাথমিক পর্য্যায়ে 'কৃষ্ণনাম' রুচিপ্রদ না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তাঁদের রসনা অবিদ্যা দ্বারা উত্তপ্ত এবং তাঁদের কর্ণ সর্ব্বদা আন কথা শুনতে অভ্যস্ত।—প্রাথমিক পর্য্যায়ে তাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ নামগুণ চরিতাদি রুচিপ্রদ না হওয়া বিচিত্র নয়—কিন্তু যদি কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুদিন সেবন করা যায় বা শ্রবণ করা যায়—তবে কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ ভোগব্যাধির মূল অবিদ্যা অপনোদিত হয় এবং নামে রুচি জন্মে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শুধুমাত্র জপ্য নয়, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়ও বটে। মহামন্ত্র কেবল জপ্য বা অজপা নয়—উভয়ই।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী চৈতন্যাষ্টকে লিখেছেন—

হরেকৃষ্ণত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নাম গণনা,
কৃত গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটি সূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গযুগল খেলঞ্চিত ভুজঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নামোচ্চারণ করতে করতে যাঁর রসনা নৃত্য করতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁর উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশাল নয়নযুক্ত ও আজানুলম্বিত ভুজ সমন্বিত -সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন পথে আসবেন ?

পশুপক্ষী কীট—আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে ॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥
জপতো হরিনামানি, স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জপন্ শোতৄন্ পুনাতি চ ॥

—শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্য।

যিনি হরিনাম জপ করেন, তদাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, এতে দ্বিমত কি ? যেহেতু জপকর্ত্তা (যিনি কেবল নাম জপ করেন) কেবল মাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন—কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শোতৃ-সাধারণকে পবিত্র করে থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বনাম প্রচার লীলাতেও দেখা যায় যে,—

'আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—'কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥
কি শয়নে, কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥ —চৈঃ ভাঃ ম ২৮ অঃ

নাম সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতেও উল্লেখ রয়েছে—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

—চৈঃ চঃ আ ৪ পঃ এবং কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'।

নাম থেকেই প্রেম। প্রেম শব্দটি শুধু ছিল অভিধানে। আমরা সচরাচর সাহিত্যে, উপন্যাসে, গল্প ইত্যাদিতে যে প্রেম শব্দটি ব্যবহার করি—তা অসঙ্গত। প্রেম পৃথিবীতে অনর্পিত। মহাপ্রভুই প্রেমের সন্ধান দিয়ে—কৃষ্ণ প্রেম তন্ময়তায় আমাদের ধন্য করলেন। নিরপরাধ ব্যক্তি—নাম নিতে নিতেই প্রেমের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেতে পারেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বললেন—

কৃষ্ণমন্ত্র জপ' সদা—এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

কৃষ্ণমন্ত্র জপের ফলে মায়াবদ্ধ জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ হয়ে থাকে। এবং অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভের ফলে অপ্রাকৃত অভিমানের (অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যের) প্রবৃত্তি সঞ্জাত হয় এবং প্রাকৃত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। তখন দেহে 'আমি' বা দেহ সম্পর্কিত বিষয় বস্তুতে 'আমার'—এরূপ বুদ্ধি থাকে না। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ (দাস্য সখ্য ইত্যাদি) সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় তাঁকে সম্বোধনের যোগ্যতা লাভ হয় অর্থাৎ নিরপরাধে নাম কীর্ত্তনের অধিকার জন্মে। এবং সেরূপে কীর্ত্তনের ফলে—প্রেম-মহাধন লাভ হয়।

এরূপে নাম সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমেই সনাতন পুরুষ মহাপ্রভু জাতি ও সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ভেঙে সকল মানুষকে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পরমার্থের অধিকার প্রদান করেছিলেন।

পরম করুণাময় হয়েও শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগের মন্ত্র শিখিয়েছিলেন আমাদের। স্বীয় সঙ্গী ছোট হরিদাসকে বর্জ্জনের মধ্যেই তাঁর ক্ষমাহীন দৃপ্ত কঠোরতা প্রকাশ পায়। এবং সেই কঠোরতার মহান্ আদর্শ বর্ত্তমানকালেও আমাদের মানবতা—বোধের প্রেরণা যোগায়।

যে সনাতন পুরুষ করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ হয়ে ধরাধামে আবির্ভূত

হয়েছিলেন—লোকহিতের প্রয়োজনে তিনি কতখানি নির্ম্মম ও নিষ্করুণ হ'তে পারেন—ছোট হরিদাসের বর্জ্জনের ব্যাপারেই তার প্রমাণ।

গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত না হয়ে—ঐতিহাসিকগণ তথা গবেষকগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কেবলমাত্র একজন সাধারণ ধর্ম্ম সংস্কারক আখ্যা দিয়েই তাঁদের কর্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেছেন।

কিন্তু তাঁরা যদি গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিকরূপে অবহিত হ'তেন—তাঁর আবির্ভাবের কারণ, তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য তাঁর দার্শনিক মতবাদ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হ'তেন—তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেবল মাত্র একজন ধর্ম্ম-সংস্কারক আখ্যা দিয়েই তাঁদের কর্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করতেন না। প্রকৃত-পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ছিলেন ধর্ম্ম-সংস্থাপক, বিকাশক ও সেই বিকশিত সনাতন ধর্ম্মের অধিদেবতা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন—'কর্ম্মবাদ যে ভাবে অনুষ্ঠিত হো'ক, মানব সমাজের মঙ্গল প্রদানে সমর্থ নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দার্শনিক মতবাদের (সংক্ষেপে বক্তব্য) তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্রকে 'প্রস্থান' বলা হয়। শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান ও ন্যায় প্রস্থান। বেদ ও উপনিষদ শ্রুতি-প্রস্থান নামে অভিহিত।

পুরাণাদি বেদার্থ স্মরণে সহায়তা করে বলে—পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় এই স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ঘাত ব্রহ্মসূত্রের সুষ্ঠু বিচার সম্পাদন করে শ্রুতি—ব্যাক্যাদির সমন্বয় স্থাপন করা হয়েছে—তাই শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ন্যায় প্রস্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ ত্রিবিধ প্রস্থান ব্যতীত—শ্রীমদ্ভাগবতকে চতুর্থ প্রস্থান হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এবং ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বহু ভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানের বিষয় এতে যথার্থরূপে সন্নিবেশিত—তাই এই গ্রন্থ ভাগবত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষকলীলায় নবদ্বীপ ভ্রমণকালে স্বপার্ষদগণকে স্বীয় অভিন্ন স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

'গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণের অবতার॥'
সবে পুরুষার্থ "ভক্তি" ভাগবতে কয়।

'প্রেমরূপ ভাগবত' চারি বেদে কয় ॥
চারি বেদ—দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত ॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ॥

ভগবান, তদীয় ভক্ত এবং ভাগবতে কোন ব্যবধান নাই। চার বেদকে যদি দধি আখ্যা দেওয়া যায়, ভাগবত তবে নবনীত। শ্রীমদ্ভাগবত অনাদিকাল সিদ্ধ, সর্ব্ব উপনিষদাবলীর রসসার এবং পরমব্রহ্মতুল্য।

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার ॥
* * *
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন ॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ।

পুরাণান্তরেও শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করা হয়েছে—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম দ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্য্যৌ কথিতৌ যদব্ধ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশ যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব ভাতি ॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্ ॥
অপার সংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্ ॥—পদ্মপুরাণ

আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গলময় শাব্দিক অবতার, অপার সংসার সাগর পারের সেতুস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটি স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গস্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ তাঁর পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধদ্বয়—দুই বাহু, নবম স্কন্ধ কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ প্রফুল্ল মুখপদ্মস্বরূপ, একাদশ স্কন্ধ ললাট প্রদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তকের প্রতীক।

মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তি রস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ।।

*   *   *

ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ।।   —চৈঃ ভাঃ অ ৩ অ

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাশীতে অবস্থানকালে আচার্য্য লীলায় শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলেছেন—

চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় ।।
যেই সূত্রে যেই ঋক্--বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ।।
ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক, উপনিষৎ কহে একমত ।।
কৃষ্ণভক্তি রস স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ব ।।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু সর্ব্বাশ্রয় ॥
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥

—চৈঃ চঃ আঃ মঃ ২৪ পঃ

ভারতীয় ঐতিহ্য ও পারত্রিক চিন্তাধারা প্রস্থান চতুষ্টয়ের (শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান ও ভাগবত) মাধ্যমে আবর্ত্তিত। প্রস্থান চতুষ্টয়কে উপেক্ষা করে যারা অন্য মতবাদ তুলে ধরেছে—

সেগুলি তাদের ব্যক্তিগত মতবাদ মাত্র। ভারতীয় ঐতিহ্য ও পারত্রিক চিন্তাধারার ঐ সকল মতবাদ যোগসূত্রবিহীন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন—পরমব্রহ্ম নির্গুণ। মহাপ্রভু বললেন—তিনি সগুণ এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বললেন—'মায়া সৎও নয়—অসৎও নয়।' মায়া তবে প্রকৃত কি? এ সম্পর্কে শঙ্করের কোন ব্যাখ্যা নেই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—ভগবান মায়াধীশ, জীব মায়াবদ্ধ।

ভগবান সগুণ, নির্গুণ—তিনিই সব। সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় একমাত্র ভগবানেই সম্ভব। অদৃশ্য এবং অব্যক্ত হয়েও ভগবান—আবার স্বেচ্ছাক্রমেই ব্যক্ত হয়ে থাকেন। ভূমা ভূমিতেও অবতীর্ণ হতে পারেন। তাঁর অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই এসব সম্ভব। তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান। তিনিই একমাত্র পুরুষ, তিনিই পরম পুরুষ, তিনি সনাতন পুরুষ। বিশ্বের যিনি আত্মা তিনি স্বেচ্ছাক্রমে নিজেকে নিজে অনায়াসে জানতে ও জানাতে পারেন। বিশ্বাত্মার নিজেকে জানার কাজইতো চলছে অহরহ বিশ্ব জুড়ে। ফুল বিকশিত হচ্ছে, নদী সাগরের দিকে ছুটছে, পাখী গান গাইছে, বাতাস বইছে। এই নিখিল বিশ্বের যত বেগ, তার মূলে নিখিলানন্দের আত্মাস্বাদনের পরম আবেগ। বিশ্বের যত বিভূতি—তার মূলে রসব্রহ্মের রসের আকুতি।

পরম পুরুষ শ্রীভগবান আত্মধ্যানে মগ্ন। কিন্তু রসের আকুতি থেকেই তাঁর ভালবাসার আকুতি। একা একাতো আর ভালবাসা যায় না। অথচ নিজেকে নিজে ভোগ করতে হ'লেও ভালবাসা একান্তভাবে দরকার; একক ভাবে ভালবাসা চলে না। তাই এক থেকে—তিনি হ'লেন দুই। দুই থেকে আবার তিন। তিনি সৎ, পৃথক হয়ে চিৎ—অর্থাৎ দুই হ'লেন। সৎ এবং চিৎ—অর্থাৎ দু'য়ের সম্ভোগে 'আনন্দ'।

অতএব তিনিই সচ্চিদানন্দ, তিনি বিষয়—যাকে পৃথক করলেন, তিনি আশ্রয়। মধুর মিলনে ঘনায়িত হ'লো রস।

বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় রাধা।

সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মেও ভগবান নির্লিপ্ত, কারণ তিনি নিজের অনাবিল আনন্দেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁর কৃপাপ্রদত্ত আনন্দের কণামাত্র লাভ করেও জীব আনন্দ লাভ করে।

''রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি।
কো হ্যেবানাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দয়তি।' —তৈত্তিরীয় ২।৭

সেই পরম তত্ত্বই রস-স্বরূপ। সেই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েই জীব আনন্দ লাভ করে। কেই বা শরীর বা প্রাণ চেষ্টা লাভ করত—যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দ স্বরূপ না হ'তেন? তিনি সকলকে আনন্দ প্রদান করেন।

জীবের আত্মানন্দ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হওয়ায় সে দীন। জীব তাই কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত। ভগবান রাগাদিদোষরহিত, জীব রাগাদি-দোষযুক্ত। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশ। মায়াধীশ ভগবান এর বশীভূত নন্।

"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ"।

—চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা--সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিরাকরঃ ।।

*　　*　　*

স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।
স্বাবির্ভূ'ত- পরমানন্দ স্বাভির্ভূ'ত—সুদুঃখভুঃ ॥
স্বদৃগুত্থবিপর্য্যাসভবভেদজভীশুচঃ।
যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুম্ ।।

—শ্রীধর।

ভগবান সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত, অতএব সংক্লেশ সমূহের আকর।

মায়া যাঁর বশীভূত তিনিই ঈশ্বর বা ভগবান—মায়া দ্বারা যিনি

পীড়িত তিনিই জীব। স্বয়ং ভগবানেই পরমানন্দ অবস্থিত, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের নিজ মধ্যেই আত্যন্তিক দুঃখ ভূমিকা বিদ্যমান। জীব যে নৃহরির মায়ায় মুগ্ধ হয়ে নিজ মায়িক দর্শন সঞ্জাত বিপরীত বুদ্ধি (অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত) জনিত কারণে ঈশ্বর রহিত বিশ্বে ভেদ দর্শন হেতু ভয় ও শোক ভোগ করতে থাকে।

জীব মায়া বশীভূত হেতু চির অভাবগ্রস্ত। ঈশ্বরের কাছে তাই তার অনন্ত চাহিদা। ধন দাও, যশ দাও, রূপ দাও। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে সেই দীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন—আর চাওয়া নয়। ভগবানকে ভালবাসো। ঈশ্বরকে ভালবাসলেই সব অভাব বোধ দূর হ'বে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন ভগবদ্ প্রেমই পূর্ণতা দানে সমর্থ। সেই প্রেমে নিত্য অনুপম আনন্দ লাভ কর।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রায় সমগ্র ভারত একাকী পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর দার্শনিক বিচার এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তির মাধুর্য্যে জনগণের চিত্ত জয় করেন।

জীবের প্রকৃত স্বরূপ—'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।' মহাপ্রভু স্পষ্টকণ্ঠে জানালেন জীবের অদূরদর্শিতা জনিত ভোগবাদ প্রকৃত মনুষ্য মর্য্যাদার অনুপযুক্ত। নিত্যসত্ত্বা, নিত্য আনন্দই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত, দৈহিক ও মানসিক অস্থায়ী সুখ বিধান নয়। দৈহিক ও মানসিক সাময়িক অস্থায়ী সুখ বিধানের জন্য অন্যান্য পশুরাও তৎপর—তবে মানুষে আর পশুতে পার্থক্য কোথায়? দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে লাভ হ'লো কি? জন্মান্তরবাদ নিয়ে পৃথিবীর নানাদেশে এখনও গবেষণা চলছে—জন্মান্তরকে অনেকেই এখন বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। অতএব ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না আর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যর্থ জ্ঞানালোচনা থেকে দর্শনশাস্ত্রকে মুক্ত করলেন। ব্যর্থ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ থেকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করলেন।

ভগবান অচ্যুত। 'সর্ব্বথা ভক্তহৃদয়াৎ চ্যুতিরহিত যঃ সঃ।' শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন, ভক্তি এক অচিন্ত্য অভিজ্ঞতা। যার সাধক ও সাধ্য বস্তু অপ্রাকৃত দেহে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করে। ভক্তি এক দুর্বিজ্ঞেয় পরম পরতত্ত্ব।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।

—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১

ভক্তিলতা বীজ অর্থ শ্রদ্ধা। ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টি লাভ না করলে—ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায় না। দুর্বিজ্ঞেয় ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথ রূপে অবহিত হওয়া যায় না। গ্রন্থাদি ও শাস্ত্রাদি পাঠ করে তার্কিক হওয়া যায় বটে—কিন্তু কৃপা ব্যতীত প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় না। সংশয় দূর হয় না। সংশয় দূর না হ'লে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে না। ঈশ্বরের প্রিয়জন (অর্থাৎ সাধু-গুরু-বৈষ্ণব) ব্যতীত ভগবানের যশঃ যথাযথ রূপে অন্য কারো পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব নয়। নিজে আলোকিত না হ'লে—অপরকে আলোকিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ফাঁকিবাজীর অবকাশ কোথায়? যাঁনি ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনবহিত—তিনি কিরূপে অবহিত করতে সমর্থ হবেন?

যিনি জীবনে কখনও রসগোল্লা দেখেন নি বা খান নি—তিনি অপরের কাছে কি করে রসগোল্লার আস্বাদ ব্যক্ত করতে সমর্থ হবেন? অবশ্য রসগোল্লা না খেয়েও কেউ কেউ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে অপরকে বলতে পারেন—'আমি রসগোল্লা খেয়েছি। আমি রসগোল্লার আস্বাদ জানি। 'আমি ভগবানকে জেনেছি। ঈশ্বর লাভের আনন্দ পেয়েছি।' এ ধরনের লোকেরা নিজদেরকেও বঞ্চনা করেন, অপরকেও বঞ্চনা করেন। এ ধরনের বঞ্চনাকারীগণ—সাধু-গুরু-বৈষ্ণব পদবাচ্য হ'তে পারেন না। পুলিশের কাজ শান্তিরক্ষা করা—কিন্তু কেউ যদি পুলিশের পোষাক পরে চুরি করে, সমগ্র

পুলিশ সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করা অসঙ্গত। তদ্রূপ বৈষ্ণব বা সাধুর ছদ্মবেশে কোন অসাধু বা বঞ্চক যদি অপরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তৎপর হয়—তজ্জন্য সমগ্র বৈষ্ণব বা সাধু সমাজকে দোষী করা অন্যায় এবং অসঙ্গত।

প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব ঈশ্বরের একান্ত আপন জন। তাঁদের কৃপাতেই ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথ রূপে অবহিত হওয়া সম্ভব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই বললেন—

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

কপিলাবতারেও একথা ভগবান বলেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো।
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।

- ভাঃ ৩।২৫।২৫

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ থেকে আমার বীর্য বা মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি-উৎপাদিকা কথা আলোচিত হয়, তা প্রীতির সঙ্গে সেবা করতে করতে অচিরেই অবিদ্যা নিবৃত্তির বর্ত্ম স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তি সঞ্চার হবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্র-নন্দনও সেই কথারই পুনরুক্তি করে বললেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয়—শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ—নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥

রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ-প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন, সর্ব্বানন্দধাম।।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেমেই (তথা ভগবৎ-প্রেম) পূর্ণতা, নিত্য আনন্দের আকর। জাগতিক বিষয় —এমন কি মুক্তিও সেই প্রেমের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সেই প্রেমই চির অভাবগ্রস্ত জীবকে পূর্ণতা প্রদানে সমর্থ। সেই প্রেমেই জীব সকল দীনতা ও হীনতা থেকে মুক্ত হয়ে—পরিপূর্ণ নিত্য-অনুপম আনন্দের অধিকারী হ'তে পারে। মহাপ্রভুই জীবকে অমৃতের সন্ধান দিলেন। যে অমৃতের কাছে সমুদ্রোত্থিত অমৃত বা স্বর্গামৃত তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বললেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বঃ ৪।১১

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে ভক্তির চতুঃষষ্ঠি সাধনাঙ্গ বর্ণন প্রসঙ্গে —'সাধুমার্গানুগমন' নামক একটি সাধন মার্গের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

সাধুগণ যে মার্গ অনুসরণ ক'রে হরিভক্তি লাভ করেছেন—সেই মার্গেরই অনুগমন বাঞ্ছনীয়। কারণ, ভাগবত—মহাজনগণ-প্রদর্শিত-পথই অভ্রান্ত এবং সর্ব্বলোক মঙ্গলকর। জীব যদি সেই পথে অনুগমন না করে—মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে নিজের খেয়ালখুশিমত পথ অনুসরণ করে, মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত চিত্তে হরিকথা শ্রবণ করে, কীর্ত্তন করে এবং শ্রদ্ধাভক্তির অভিনয় করে—তবে সেই পথ শাস্ত্রাদি এবং মহাজনগণের অননুমোদিত বিধায় ভক্তিপ্রিয় ভগবানে প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। খেয়াল-খুশীমাফিক শ্রদ্ধায় হরিপ্রীতি

সঞ্জাত হয় না, অতএব শ্রদ্ধাকে শাস্ত্রাদি শ্রবণ-দ্বারা পরিপুষ্ট করা বিধেয়।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু স্বরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ব-ভাগের দ্বিতীয় লহরীর ৭৬ শ্লোকে সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন প্রসঙ্গে বলছেন—

স্কান্দে—স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥
ব্রহ্ম যামলে চ—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

মঙ্গলের নিমিত্ত সন্তাপবর্জ্জিত সেই পথেরই অনুসন্ধান করতে হবে—যে পথে পূর্ব্বে সাধুগণ অনায়াসে গমন করেছেন।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ এবং পঞ্চরাত্রির বিধি ব্যতীত যে ঐকান্তিকী হরিভক্তির অভিনয়, তা কেবল উৎপাতই সূচনা করে।

শ্রুতি-স্মৃতি এবং পঞ্চরাত্রি বিধি অনুমোদিত ভক্তিরই বশ ভগবান্।

ভক্তের সন্তোষেই ভগবানের সন্তোষ।

"ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণ কর্ম্ম না জানয়ে আর॥

*　　*　　*

অসুর স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥

অদৃশ্য এবং অব্যক্ত হয়েও ভগবানকে তাই ভক্তজনের কাছে ধরা দিতে হয়। ভূমাকেও ভূমিতে অবতীর্ণ হ'তে হয়। সেই অসীম অনন্ত পরম পুরুষকে সীমার মাঝে এসে প্রকট হ'তে হয়। ভক্তির শক্তি অচিন্ত্য।

প্রকৃত ভক্ত সকল দীনতা ও হীনতামুক্ত। তাঁরা ভগবানের কাছে কোন কিছু আত্মেন্দ্রিয় স্বার্থের প্রার্থনা করেন না।

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং,
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎ প্রপন্নাঃ।

অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥

—ভাঃ ৮।৩।২০

গজরাজ ভগবানকে বললেন—ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্ত্তন পূর্ব্বক আনন্দ সাগরে মগ্ন, তাঁরা আপনার (ভগবানের) নিকট কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না।

ভক্তের কৃপা ছাড়া ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুমানাদির দ্বারা জ্ঞেয় নন্। তিনি তাঁর রূপগুণ, লীলা ও ঐশ্বর্য্য সকলই তর্কাতীত—

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥

—চরিতামৃত ম ৬ পঃ

ভক্তের মাধ্যমেই ভগবানের কৃপা সাধারণ জীবে বর্ষিত হয়। এবং সে কৃপা যাদৃচ্ছিকী!

"প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্।"

—ভাঃ ৭।৭।৫২

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বললেন—কেবলমাত্র নিষ্কাম ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হয়ে থাকেন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনও বললেন—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক—কৃষ্ণ-প্রেমরস ॥

—চৈঃ চঃ ম ১৭ পঃ

জ্ঞানকর্ম্মাদি যোগ ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণকে বশ করা সম্ভব নয়—একমাত্র প্রেম ভক্তিরই অধীন ভগবান।

ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ত্যজি।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণবশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ

*　　　　　　　*　　　　　　　*

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান—ত্রিবিধ প্রকাশে॥
ব্রহ্ম-অঙ্গ কান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংশ॥
'ভক্তে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥

নিখিল বিশ্বের 'আত্মার' আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসীম অনন্ত রূপ—একমাত্র ভক্তই ভগবানকে পূর্ণরূপে অনুভব করতে সমর্থ।

"নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভি—
যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্ত্তী" ॥　　—ভাঃ ৪।২০।১৬

শ্রীভগবান পৃথুকে বললেন—সমচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আমি প্রকাশিত হয়ে থাকি। যজ্ঞ, তপস্যা বা যোগদ্বারা আমি কখনও সহজলভ্য নই।

শ্রীভগবান অনন্তশক্তি বিধায় সর্ব্বসাধনগম্য হলেও ভক্তি যেরূপ ভগবানকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হবার সাধন। কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি তদ্রূপ নয়।

নিষ্কিঞ্চন, শান্ত, নিরভিমান, সর্ব্বজীববৎসল, বিষয়রাগের দ্বারা অস্পৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ ভগবানে অনুরক্তচিত্ত হয়ে তাঁর সেবা করে থাকেন। তাঁরাই নিরপেক্ষজনলভ্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, অন্যে সে-ধরণের পরমানন্দ লাভ করতে পারে না।

জ্ঞানীগণের চিত্তে বিষয়াসক্তি না থাকলেও ভগবানের প্রতি তাঁদের আসক্তির সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু ভক্তগণ সর্ব্বদা ভগবদানুরক্ত চিত্ত হওয়ায়—সর্ব্বদা বাসনামুক্ত, অতএব তাঁরাই প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন।

ন যেষাং ভজনাদন্যচ্চিকীর্ষিতমভীপ্সিতম্।
জিজ্ঞাসিতঞ্চ কিঞ্চিত্তে জ্ঞেয়া নিষ্কিঞ্চনা বুধৈঃ ॥

যাঁদের ভজন ব্যতীত অন্য বাঞ্ছিত, অভীপ্সিত এবং কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসিত বিষয় নেই—পণ্ডিতগণ তাঁদেরই নিষ্কিঞ্চন বলে থাকেন।

ভক্তগণের সকল সংশয় অপনোদিত। ভজন ব্যতীত তাঁদের আর জিজ্ঞাসিত বিষয় কি থাকতে পারে? অতএব ভক্তগণই প্রকৃতপক্ষে নিষ্কিঞ্চন।

ভক্তগণ সর্ব্বদা কামদেব ভগবানের সেবানিরত থাকায়—জাগতিক ভোগ সমাগত হলেও তাঁদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটে না। তাঁরা সর্ব্বদা নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত।

'তাঁরা কৃষ্ণসেবানন্দে যে কি সুখ আস্বাদন করেন, তা কেবলমাত্র তাঁরাই জানেন, অন্যে নয়।'—শ্রীভগবানের উপরোক্ত শ্রীমুখ বাক্যেও মনে হয় যে ভগবানের সেবানন্দ সম্বন্ধে সেব্য ভগবানও অবহিত নন্। সেই সেবানন্দকে উপভোগ করার জন্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় আসতে হ'লো।

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর?
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২৮ পঃ

মোক্ষাদিতেও ভক্তগণের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, কারণ—

'মোক্ষ সুখো 'অল্প' মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥'

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩ অঃ

'মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ'।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন॥ —চৈঃ চঃ ম ১৮ পঃ

ভক্তগণ ভগবানের চরণ সেবনেই পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অতএব তুলনামূলকভাবে মোক্ষাদি জনিত কণামাত্র আনন্দের জন্য তাঁরা লালায়িত হবেন কেন?

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগলভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—হে উদ্ধব ! যিনি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ নন্, আমার তাদৃশ প্রাকৃত ভক্তও বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হন্ না।

ভক্তগণ পূর্ণানন্দ এবং অখিল জীববৎসল—
ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা—
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।

আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহ ভাজা—
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ —ভাঃ ৯।২১।১২

রন্তিদেব বললেন—আমি ভগবানের নিকট অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত অপুনর্ভব বা মোক্ষ প্রার্থনা করি না, কিন্তু যেন সর্ব্বজীবের অন্তঃস্থিত হয়ে তাঁদের দুঃখ প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা যেন অন্য জীবের দুঃখ রহিত হয়।

শ্রীগৌরাবতারেও পরদুঃখে দুঃখী বাসুদেব দত্ত ঠাকুর বললেন—

'জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্ব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে ॥

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ ॥ " —চৈঃ চঃ ম ১৫ পঃ

কোটি কোটি মানুষের বেদনা শান্তিপুরের একটি মানুষকে (অদ্বৈত প্রভু) বেদনার্ত্ত করে তুলেছিল। তিনি জগৎ শান্তির জন্য তাই ব্যথাতুর হয়েছিলেন—তাঁর আর্ত্তস্বরেই ভূমার আসন টলেছিল ভূমা তাই নেমে এসেছিলেন ভূমিতে। অচিন্ত্যপূর্ব এই বার্তা।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ তাই রাধার ভাব ও কান্তি স্বীকার করে নদীয়ায় এলেন। তাঁকে যাঁরা শুধু একজন ধর্ম্ম সংস্কারক আখ্যা দিয়ে—কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করতে চান্—তাঁরা বিভ্রান্তির শিকার। তাঁরা ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচিত হলেও, ভক্তির ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচিত নন্।

সাধারণ ব্যাকরণে যেমন 'অচ্যুত' শব্দটির ব্যাসবাক্য লেখা হয়—অ-চ্যুত যঃ সঃ অচ্যুত। কিন্তু ভক্তির ব্যাকরণ আলাদা, এরাজ্যে সাধারণ বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকের প্রবেশাধিকার নাই। কারণ তাঁর কৃপা ছাড়া এ রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। সাধারণ ব্যাকরণ ও ভক্তির ব্যাকরণের পার্থক্য যে অনেক। ভক্তির ব্যাকরণে ঐ অচ্যুত

শব্দটির ব্যাসবাক্য লেখা হবে—'সর্ব্বথা ভক্তহৃদয়াৎ চ্যুতিরহিতঃ যঃ সঃ—অচ্যুত।'

অতএব যে সকল বাঙ্গালী মণীষীগণ বা ঐতিহাসিকগণ শ্রীচৈতন্য-দেবকে মার্টিন লুথারের মতো একজন ধর্ম্মসংস্কারক আখ্যা দেন, তাদের আমি তথাকথিত জ্ঞানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করতে অনুরোধ জানাই। ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করলেই তাঁরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপক, বিকাশক এবং বিকশিত সেই সনাতন ধর্ম্মের অধিদেবতা।

অবশ্য সেখানে পৌঁছেই ক্ষান্ত হতে পারবেন না তাঁরা—ভূমিতে অবতীর্ণ ভূমাকে দেখে চমকিত হবেন।

১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা আলোকিত সন্ধ্যায় সিংহরাশি সিংহলগ্নে নবদ্বীপের শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গণে শ্রীশচীদেবীর গর্ভসিন্ধু থেকে করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন্।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলা—পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সংঘর্ষময় যুগের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। ইউরোপেও ঐ সময় মধ্যযুগের অবসানকাল আসন্ন। প্রেম ও করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেবের সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভাব সাধারণ বিচারেও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর ইহ জগতে অবস্থান করেছিলেন। তন্মধ্যে ২৪ বছর নবদ্বীপে গৃহস্থাশ্রমে এবং বাকী ২৪ বৎসর সন্ন্যাসী ধর্ম্মপ্রচারক রূপে অতিবাহিত করেন। লীলা অপ্রকট করার আগের ২৪ বছরের ৬ বছর তীর্থ ভ্রমণে, ৬ বছর ধর্ম্মপ্রচারে এবং অবশিষ্ট দ্বাদশ বছর তিনি রায় রামানন্দ ও দামোদর স্বরূপ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পরিকরগণের সঙ্গে কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে দিব্যোন্মাদনায় অতিবাহিত করেন। পরম করুণাময় সনাতন পুরুষ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং জাতিধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে পরমার্থের অধিকার দিয়েছেন। ব্যর্থ

জ্ঞানালোচনা থেকে দর্শনকে তিনি মুক্ত করলেন, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সর্ব্বস্ব হয়েছিল ধর্ম্ম—সেই ব্যর্থ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ থেকে ধর্ম্মকে রক্ষা করলেন। চিরকালের অভাবগ্রস্ত মানুষকে অতীতে যা ছিল অনর্পিত সেই প্রেমধনে ধনী করলেন।

তিনি যে নূতন ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তন করলেন তা শুধু মানুষকে পারত্রিক জগতের নিত্য আনন্দ দিয়ে ক্ষান্ত নয়, জাগতিক বিচারেও তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও দার্শনিক বিচার—যুক্তিমূলক, নীতিমূলক, পরমার্থমূলক—যা মানুষে মানুষে অযথা ভেদাভেদ বিদূরিত করে।—সারা বিশ্বের মানুষকে মহামিলনে সম্মিলিত করতে সমর্থ। বিশ্বের সমগ্র মানব সমাজকে—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই এক অভিনব দিব্য পারমার্থিক সত্ত্বায় বিকশিত করতে সমর্থ।

যে কুসংস্কার ও ভেদনীতি দেশে দেশে তথা সমগ্র বিশ্বে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে—করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপী ভগবান সেই ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকেই পরমার্থের অধিকার দিয়েছেন। সব চেয়ে বড় কথা তিনি মানুষকে চিরন্তন দীনতা ও হীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে—প্রেমামৃতের সন্ধান দিয়েছেন। দেবতার কাছে মানুষের কিছু চাওয়ার নেই। চাওয়ার মধ্যে পূর্ণতা নেই। নিষ্কাম প্রেমেই পূর্ণতা।

বৈদিক যুগ থেকে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে অনেক আলোকবর্ত্তিকা। সকল বাদানুবাদকে খণ্ডন করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে আলোর ছটা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন—তা' অচিন্ত্যপূর্ব—এবং উপমাহীন।

যুগযুগান্ত ধরে মানুষ ঈশ্বরের জন্যে কেঁদেছে। কিন্তু নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজে স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম হয়েও ধরণীর ধূলিতে নেমে এসে মানুষের জন্য পথে পথে ঘুরে ঘুরে কাঁদলেন।

"উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।" এ করুণার তুলনা কোথায় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

"রাধা-ভাব হরিভক্তি, 'জীবের নিস্তার,
এই তিন বাঞ্ছা পুরাইতে অবতার ॥"

যুগ সন্ধিক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। ধর্ম্ম কলহে বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক তর্ক বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধিতে দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি তথা সমগ্র ভারতবাসী। দর্শন—তখন শুধুমাত্র ব্যর্থ জ্ঞানালোচনায় পর্য্যবসিত। ধর্ম্ম তখন শুধুমাত্র ব্যর্থ আচার ও অনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সর্ব্বস্ব। বাংলা তথা ভারতের যখন এই অবস্থা, পাশ্চাত্য দেশেও যখন মধ্যযুগের অবসান কাল আসন্ন—সেই সময়েই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস দেশের তৎকালীন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

কৃষ্ণনাম ভক্তিশূণ্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্যৎ আচার ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে ॥

*　　*　　*

দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোন্ জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন ॥

ধর্ম্ম শুধু মাত্র ব্যর্থ আচার ও অনুষ্ঠান সর্ব্বস্ব হয়ে পড়েছিল। চিরদিন মানুষের দীনতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল—দেবতাদের কাছে মানুষ শুধু আকুল হয়ে চাইত। ভেদবুদ্ধি দ্বারা সমগ্র মনুষ্য সমাজ নানা ধর্ম্মে, নানা মতে—নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তামসিক ভাবের বিকাশের ফলে পারস্পরিক সংঘর্ষ ও ভেদবুদ্ধি মানুষকে বিপথে চালিত করছিল।

গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখান নাই তাহার জিহ্বায়।

সকল সংসার মত্ত ব্যবস্থার বশে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কার বাসে ॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত ভাষ্য দ্বারা পণ্ডিতগণও তখন বিভ্রান্ত। কৃষ্ণতত্ত্ব বিস্মৃতির অন্ধকারে প্রায় অবলুপ্ত। রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি দ্বারা সাধারণ মানুষ মুগ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত—কেউ কেউ বা বলছেন পরমেশ্বর হয়েও যখন তিনি দৃশ্যমান সাধারণ শরীর ধারণ করেছিলেন—তখন তাঁর সেই শরীরও অনিত্যই। হতবুদ্ধি জনগণ শাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যা দ্বারা সঠিক মত ও পথ সম্বন্ধে অনবহিত।

"অনেক শক্তিমান সূক্ষ্মকারণোপাধি মায়াই ভগবদ্দেহ্।" এ ধরণের শাস্ত্র ভাষায় যখন প্রায় প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র দেশের যখন এই সঙ্কটজনক অবস্থা। কোটি কোটি মানুষের বেদনা শান্তিপুরের একটি মানুষের হৃদয়কে বিচলিত করে তুলল। জগৎ শান্তির জন্য তিনি আকুল আহ্বান জানালেন। তাঁর আত্মস্বরে ভূমার আসন টলল। করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ হয়ে ভূমা তাই নেমে এলেন ভূমিতে।

শান্তিপুরের শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য প্রতিদিন গঙ্গাজল তুলসী দ্বারা ভূমিতে ভূমার উপস্থিতি ও আগমন প্রতীক্ষায় ধৈর্য্য ধরে অবস্থান করছিলেন।

যেখানে যেরূপ ভক্তগণে করে ধ্যান।
সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥
ভক্তলাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ম্ম না জানয়ে আর॥

—চৈতন্যভাগবত ম ২৩ অঃ

বাংলায় তৎকালে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত থাকলেও বিভিন্ন ছোট বড় হিন্দু রাজাগণের আনুকূল্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে দেবভাষা

অর্থাৎ সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা বিদ্যমান ছিল। মুসলমান রাজত্বের প্রভাব নবদ্বীপকে কমবেশী প্রভাবান্বিত করলেও প্রাচীনকাল থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চ্চার অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে চিরপ্রসিদ্ধ।

শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণচাক গ্রাম থেকে সংস্কৃত অধ্যয়ন মানসেই জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে এসেছিলেন। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ মিশ্র, এবং মাতার নাম শোভা দেবী। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শচী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন জগন্নাথ মিশ্র। অবশ্য কেউ কেউ বলেন জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার যাজপুর থেকেই শ্রীহট্ট জেলায় এসেছিলেন। শচী দেবী শ্রীহট্ট জেলার জয়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র গৌরভক্তজনের কাছে অনেক নামে পরিচিত—পুরন্দর মিশ্র, মিশ্রচন্দ্র, মিশ্রবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৪০৭ শকে (ইংরাজী ১৪৮৫ খৃঃ) চতুর্দ্দশ মাসে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ মাসের পর শচীদেবীর গর্ভসিন্ধু হ'তে গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন) ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য্যাস্ত সময়ে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, সিংহ লগ্নে, সিংহ রাশিতে রাধার ভাব কান্তি অঙ্গে ধারণ করে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। (শচীদেবীর উদরে জন্মগ্রহণ করা সনাতন পুরুষ গৌরাঙ্গদেবের পক্ষে একটি বাদমাত্র)। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর নাম এবং শরীরে যেমন অভেদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনের ক্ষেত্রেও সেই কথা সমভাবেই প্রযোজ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শচীদেবীর গর্ভের দশম সন্তান। পূর্বে অষ্টম গর্ভাবধি সঞ্জাত ৮টি কন্যাই অপ্রকট হন্। নবম গর্ভে শচীদেবী একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। তাঁর নাম বিশ্বরূপ। অতএব বিশ্বরূপই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর। শচীদেবীর দশম গর্ভসিন্ধু থেকেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি অজ, শচীদেবীর উদরে জন্মগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে একটি বাদমাত্র।

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিদ্বয় সম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা ;
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি স্বরূপিণী ।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী ।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥
সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্য তিথি ।
সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ।
এতেক এই দুই তিথি করিলে সেবন ।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে-হেন পবিত্র ।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥

—চৈতন্যভাগবত আদি ৩ অঃ

ব্রহ্মপুরাণেও বলা হয়েছে—

যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ।
অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্ ॥
ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ ইদমেব পরং তপঃ ।
ইদমেব পরো ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণুব্রতধারণম্ ॥

যে তিথিতে সনাতন, সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষোত্তম ধরণীতে অবতীর্ণ— সে তিথি যে মুক্তিদা তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বিষ্ণুব্রতধারণই পরম শ্রেয়ঃ, পরম তপ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ।

ভগবান সনাতন। এবং তদীয় বিগ্রহও সনাতন। শরীরী ভগবান্ ও তাঁর শরীর একই পদার্থ ।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ —গীতা ৯।১১

জীবের ন্যায় পরমেশ্বর এবং তাঁর তন্নু ভিন্ন নয়, তাঁর তন্নুই তিনি। জীবের ন্যায় ভগবানের আত্মা তাঁর বিগ্রহ থেকে ভিন্ন নয়। শ্রীভগবানের দেহাদির উপাধিত্ব-অভাব হেতু—জীবের ন্যায় তাঁর সাক্ষাৎ পৈতৃক-ধাতুসম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাবাত্মক জন্ম হয়ে থাকে। ভগবানের ক্ষেত্রে দেহ-দেহীর পার্থক্য নেই। কারণ তিনি বন্ধন ও মুক্তির বাইরে।

"দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ।'
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপে 'বিভেদ' ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা—১৭ পরিচ্ছেদ

যে কথা ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সত্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। শচীদেবীর উদরে জন্মগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে একটি বাদমাত্র। শ্রীভগবান আত্ম-বিগ্রহ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপী ভগবানের যেরূপ বিগ্রহই আত্মা, তদ্রূপ আত্মাই তাঁর বিগ্রহ।

পরম ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও এ সম্পর্কে বলেছেন—

'শব্দৈকবেদ্য যে ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মময় মূর্ত্তি ধারণ করেছেন।'

কিন্তু কেউ কেউ বলবেন, ভগবান ও তাঁর শরীর যদি একই পদার্থ হয়, এবং ভগবান যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়ে থাকেন —তবে নরলোকের পক্ষে ঐ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়?

এ সম্পর্কে বলা যায় যে, জগতের হিতের জন্য ভগবান অহৈতুকী অচিন্ত্য দয়ায় এই ধরণীতে অবতীর্ণ হয়ে জগজ্জনের নিকট দেহধারীর ন্যায় প্রতীত হন্; তিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হওয়ায় ঐরূপ প্রকাশিত হন্ মাত্র। তাঁর অতর্ক্য ইচ্ছায় তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হয়ে থাকেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক অগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ তাঁকে স্বয়ংই শব্দাদির ন্যায় গ্রহণে সমর্থ হয় না।

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজ শক্তিতঃ।
তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্।"

ভগবান নিত্য অব্যক্ত হয়েও স্বীয় (অচিন্ত্য) শক্তিতে ব্যক্ত বা দৃশ্য হন্। তাঁর শক্তি ব্যতীত কে সেই অমিত ও পরমানন্দ প্রভুকে দর্শন করতে সমর্থ?

এ সম্পর্কে পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেছেন—

"ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্ব-শক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ।।"

ভগবানের স্বেচ্ছা প্রকাশিকা প্রকাশত্ব শক্তিদ্বারা তিনি স্বয়ং লোকচক্ষুতে অভিব্যক্ত হতে পারেন, কিন্তু তিনি নেত্রের বিষয়ীভূত ব্যাপার নন্।

ইন্দ্রিয়াতীত ভগবদ্দেহের যে দর্শন, তা কেবল তাঁর অতর্ক্য অচিন্ত্য কৃপাশক্তিরই মহৈশ্বর্য্য জ্ঞাপক।

তিনি স্বয়ং কৃপা পরবশ হয়ে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কে নিজ-দর্শন-সামর্থ্য প্রদান করেন, সেই ভাগ্যবান জনই তাঁকে দর্শন করতে সমর্থ হয়ে থাকে।

অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

ভগবান ও তাঁর লীলা নিত্য, তাঁর কৃপাধন্য ব্যক্তিগণই তাঁকে এবং তদীয় নিত্যলীলা দর্শনে সমর্থ।

"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি।।"

—মহাভারত শাঃ পঃ ৩৩৮।২০

হে বৃহস্পতে, তুমি অথবা আমরা তাঁকে দর্শন করতে সমর্থ নই। তিনি যাঁকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁকে দর্শন লাভে সমর্থ হয়ে থাকেন।

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বয়ং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ"॥ —পাদ্মে

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অতীন্দ্রিয় হয়েও নিজ শক্তি প্রভাবে ভক্তজনকে নিজ দর্শন প্রদানে সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবানও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ভক্ত-জনকে আপন দর্শনদানে সমর্থ হয়েছেন এবং হয়ে থাকেন।

শ্রীগৌর পার্ষদ ভক্তপ্রবর শ্রীবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাইতো বলেছেন—

অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥
লুকাও 'আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে।।

—চৈতন্য ভাগবত অঃ ৯ অ

শ্রীভগবানের বিগ্রহকে তাঁরই কৃপায় বা ইচ্ছায় ভক্ত ও অভক্ত সকলেই দর্শন করলেও—উভয়ের দর্শন বা দর্শন ফল এক হয় না।

কারণ, ভক্তবৎসল ভগবান্ আপন প্রিয় ভক্তজনকে নিজ কৃপা দৃষ্টিদানে স্বীয় মাধুর্য্যের অনুভবসহ পরমানন্দজনক স্বদর্শন করিয়ে থাকেন, আর আসুরিক ব্যক্তিগণ প্রকৃত ইন্দ্রিয় পিত্তদুষ্ট রসনায় মৎসণ্ডিকা ভোজনের ন্যায় ভগবদ্দর্শন লাভ করে আনন্দ লাভ করে না। বরং তদ্দর্শনে দুঃখ পেয়ে থাকে! দর্শনগত এরূপ তারতম্যের জন্য ভগবানের ওপর বৈষম্য দোষ আরোপ করা অনুচিত। দর্শনগত ফলের এরূপ তারতম্যের জন্য—জীবের চিত্ত-বৃত্তিই মূলতঃ দায়ী।

জননী আপন সন্তানকে মমত্ববোধ হেতু যেরূপ (সন্তানের) মাধুর্য্য সহ দর্শন করে থাকেন—অপরের পক্ষে অমমত্ব বিধায় তদ্রূপ দর্শন সম্ভব কি? চিত্তবৃত্তিই দর্শনগত এরূপ হেরফের ঘটিয়ে থাকে।

রাধাভাবদ্যুতি নিয়েই গৌরচন্দ্র ধরণীতে অবতীর্ণ হ'লেন। তপ্ত কাঞ্চনের মতো তাঁর অঙ্গকান্তি দেখে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী

তিপান্ন

ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম শচীদেবী রাখলেন 'গৌরাঙ্গ'। নিরুপম বিগ্রহ ও অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়েই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে—শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গনকে তদীয় আবির্ভাবের পর মুহূর্ত থেকেই আলোকিত করে তুলেছিলেন।

যিনি গৌরাঙ্গ, তিনিই আবার নিমাই হ'লেন। নিম গাছের নীচেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব—তাই শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যের সহধর্ম্মিনী সীতাদেবী—শ্রীভগবানের নাম রাখলেন নিমাই।

শ্রীগৌররূপী ভগবানের দিব্য অঙ্গকান্তি সন্দর্শন করে প্রতিবেশীগণ তাঁকে গৌরহরি আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত বোধ করলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ্ মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গের নামকরণ করলেন—'বিশ্বম্ভর।' যিনি জগতের ধারণ ও পোষণ করেন—তাঁর নাম বিশ্বম্ভর হওয়াই তো স্বাভাবিক।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের সময় কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের নূতন নামকরণ করলেন—'কৃষ্ণচৈতন্য'। যিনি স্বয়ং কৃষ্ণাবতার এবং জীবকে কৃষ্ণতত্ব সম্বন্ধে অবহিত করবেন—তিনি তো কৃষ্ণ-চৈতন্যই। তিনিই কৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং রাধাভাবদ্যুতি সমন্বিত শ্যামনাগর। পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন পদকর্ত্তা ও পদ-কীর্ত্তনীয়াগণ—তাঁকে গোরাচাঁদ, শচীনন্দন, গৌরগোপাল, গোরা, গৌরচন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন।

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীলোচন দাস গৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে বললেন—

দেখ দেখ আসি, যত ন'দেবাসি
আমার গৌরাঙ্গচাঁদে।
প্রভাতে উঠিয়া, অঞ্চল ধরিয়া
ননী দে বলিয়া কাঁদে॥
নহি গোয়ালিনী, কোথা পাব ননী,
একি বিষম হৈল মোরে।

শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে,

সেই সে আমার ঘরে ॥

একি অদ্ভুত, অতি বিপরীত

আমার গৌরাঙ্গ রায়।

আঙিনায় দাঁড়াঞা, ত্রিভঙ্গ হইয়া

মধুর মুরলী বায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ অনুপম, অফুরন্ত তাঁর করুণা। তাঁর রূপের যেমন তুলনা নেই, তাঁর অফুরন্ত করুণারও শেষ নেই। বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নয়নের মণি। দু'ভাই দিনে দিনে বড় হ'তে লাগলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স যখন প্রায় আট বৎসর, ষোল বৎসর বয়স্ক বিশ্বরূপ তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীশঙ্করারণ্য নামে অভিহিত হন্। মাত্র ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পুণার নিকটবর্তী পাণ্ডুপুর নামক স্থান থেকে অপ্রকট বা অন্তর্ধান হন্। কেউ কেউ বলেন বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের মধ্যে নূতনভাবে আবির্ভূত, কেউ বা বলেন বিশ্বরূপ নিত্যানন্দপ্রভুকে দুস্ত্যজ্য আপনজন পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মে ব্রতী করেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করায়—জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী দুঃখবোধ করলেন। তাঁরা ভাবলেন, শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলেই অসার সংসার ত্যাগ করে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়েছে।

নিমাইকে তাই তাঁরা আর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে দেবেন না। পণ্ডিত হয়ে আর নিমাইয়ের কাজ নেই। নিমাই গৃহাঙ্গন আলো করেই থাক। পণ্ডিত হয়ে যদি আবার বিশ্বরূপের মতো সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়—তাঁরা তবে আর কাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকবেন।

কিন্তু অনেক পিতা-মাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেরূপ স্থির করেন—বাস্তবে তা হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের যখন নয় বৎসর বয়স তখন জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে যথারীতি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়ে—তাঁর কানে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করলেন। উপনয়নের পরই নিমাইকে বিদ্যাশিক্ষায়

নিযুক্ত করা উচিত বলেই—শেষ পর্য্যন্ত জগন্নাথ মিশ্র স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। সকলেই যে পণ্ডিত হয়ে সংসারকে অসার জ্ঞানে ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবেন—এমন কথা ঠিক নয়।

নিমাইয়ের যখন বয়স প্রায় এগারো—জগন্নাথ মিশ্র তখন কালস্বরূপ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করলেন। দাদা বিশ্বরূপ আগেই তো সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, পিতাকেও হারালেন নিমাই। সংসারে একমাত্র জননী ছাড়া আর কেউ রইল না। শচীদেবীও সব হারিয়ে কেবলমাত্র প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় নিমাইকে অবলম্বন করে বেঁচে রইলেন।

জন্ম মৃত্যুতো অবধারিত বিষয়। শচীদেবীর আপনজন বলতে আর কেউ রইল না। রইল শুধু নিমাই। শচীদেবী নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিয়ে গেলেন। লেখাপড়া তো শিখতেই হবে। নিমাই তো আর মূর্খ হয়ে থাকতে পারে না।

নিমাই পণ্ডিত হোক। পণ্ডিত হলেই যে সে বিশ্বরূপের মতো সংসার ত্যাগ করবে—তাতো আর নয়। নিমাই তো জানে—তাঁর মায়ের সে ছাড়া আর কেউ নেই। পণ্ডিত হয়েও নিমাই নিশ্চয়ই মাকে দুঃখ সাগরে ভাসিয়ে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবে না।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকে যত্নের সঙ্গেই পড়াতে লাগলেন। নিমাইয়ের জ্ঞান, শিক্ষা প্রতিভাও বিকশিত হ'ল। নিমাই থেকে তিনি নিমাই পণ্ডিত হলেন।

বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় গৌরাঙ্গদেবের সংসারে আর্থিক অভাব উপস্থিত হয়েছিল। শোনা যায়—শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাঝে মাঝে তাঁর মাকে দু'-এক তোলা সোনা দিতেন। এই সোনা কোথা থেকে জোগাড় করতেন—তা শুধু তিনিই জানতেন।

প্রায় ষোল বৎসর বয়সে নিমাই বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিয়ের কিছু দিন পরই নিমাই পূর্বদেশে গিয়েছিলেন—প্রায় আঠারো বৎসরের মধ্যেই তিনি পূর্ব দেশ থেকে

নবদ্বীপে ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর আর সাক্ষাৎ হয়নি।

তিনি নবদ্বীপে ফিরে এসেই শুনলেন—সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু ঘটেছে।

প্রায় দু'বছর পরে সনাতন ঠাকুরের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

পিতৃহীন হওয়ার পর নানা কারণে নিমাই আগে গয়ায় যেতে পারেন নি। তাই শচীমাতার অনুমতি নিয়েই তিনি গয়াধামে যাত্রা করেন। গয়াতেই তাঁর মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ঈশ্বরপুরী গৌরাঙ্গদেবের গয়া অবস্থানকালে—তাঁকে গোপীজনবল্লভের দশ অক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

গয়া থেকে ফিরেই তিনি পার্ষদগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। কীর্ত্তনের মাধ্যমে তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হ'তে থাকলেন।

পরম পুরুষের আস্বাদন বিচিত্রতা এক নূতন রূপ লাভ করল। রসের ছন্দে রাধাভাবে তন্ময় হয়ে কীর্ত্তন করতে লাগলেন তিনি।

জীবের প্রতি মমত্ব বশতঃই শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরি সংকীর্ত্তন প্রচার। তিনি যে অহৈতুকী করুণার মহাসমুদ্র। সেই করুণার মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হলেন—নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য্য, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাস, শ্রীগদাধর আদি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর ও ভক্তগণ।

"তেরশত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥"

*　　*　　*

তার মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ।
রাঢ়ে স্থিত যাহার গৃহেতে পূর্ণচন্দ্র॥　　—শ্রীশ্রীভক্তমাল

বীরভূম জেলার একচক্র (বা একচাকা গ্রামে) ১৩৯৫ শকে মাঘী

শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে অবশ্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতার নাম—শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর বা হাড়াই পণ্ডিত একই ব্যক্তি। একটি পোষাকী নাম, একটি ডাক নাম। নিত্যানন্দ প্রভুর মায়ের নাম পদ্মাবতী, পিতামহের নাম সুন্দর মল্ল। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

নিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশ বৎসর কালাবধি স্বগৃহেই অবস্থান করেন।

আকস্মিক ভাবেই একচাকা গ্রামে একদিন এক সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। সেই সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের কাছে নিত্যানন্দ প্রভুকে ভিক্ষা স্বরূপ প্রার্থনা করেন। (কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে—নিত্যানন্দ প্রভুকে বিশ্বরূপেরই সন্ন্যাসরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।)

সন্ন্যাসীর কথা শুনে হাড়াই পণ্ডিত ও তাঁর স্ত্রী ভীষণ বিচলিত হলেন। এ কী প্রার্থনা সন্ন্যাসীর! পিতার কাছে তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে ভিক্ষাস্বরূপ প্রার্থনা। এ প্রার্থনা কিরূপে পূরণ করা সম্ভব। পুত্র যে পিতা-মাতার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়! সেই পুত্রকে কিরূপে ভিক্ষাস্বরূপ সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব। সন্ন্যাসী কি আর অন্য কিছু চাইতে পারল না।

নিত্যানন্দ প্রভুকে বাড়ীর বাইরে বের হতে দেবেন না বলে স্থির করলেন তাঁরা। কিন্তু পরে তাঁরাই আবার সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতের ভয়ে অথবা অন্য কারণে প্রিয়তম পুত্র নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর হাতে অর্পণ করলেন।

ঘর ছেড়ে নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। বিশ্ব জোড়া যাঁর আবাস—ঐ ছোট ঘরে তাঁকে মানাবে কেন?

বহু পথ, বহু তীর্থ ঘুরে—তিনি বোম্বাই প্রদেশের পাণ্ডাপুর নামক স্থানে উপনীত হন্ এবং মাধবাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তারপর আরও বহু পথ ও বহু তীর্থ পর্য্যটন করে তিনি বৃন্দাবনে উপনীত হন্, এবং বৃন্দাবনে কিছুদিন অতিবাহিত করে—শ্রীধাম নবদ্বীপে এসে নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন।

"তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর॥

নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাসকে নন্দন আচার্য্যের গৃহে প্রেরণ করেন। কিন্তু শ্রীবাসের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ না ঘটায়। মহাপ্রভু স্বয়ং অন্যান্য ভক্তগণ সহ নন্দন আচার্য্যের গৃহাঙ্গনেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শুভ সম্মিলন হয়।

নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্বাশ্রম নাম কুবের। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিত্য আনন্দ প্রদান করতেন বলেই—তিনি নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন রাধাভাবে আকুল হয়ে কৃষ্ণ চিন্তায় তন্ময় হ'তেন—নিত্যানন্দ মহাপ্রভুই তখন তাঁকে প্রেমালিঙ্গন—পাশে ধরে রাখতেন। তাই তিনি শুধু নিত্যানন্দই নন—বিশ্বম্ভর ধরও বটেন। যিনি বিশ্বম্ভরকে ধারণ করতে সমর্থ—তিনিই তো বিশ্বম্ভর-ধর।

চৈতন্য ভাগবতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে 'ব্রহ্ম বধিয়া' এবং 'মাতালিয়া' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্ম বধিয়া শব্দের অর্থ যিনি ব্রহ্ম-হত্যাকারী—অর্থাৎ ব্রহ্ম বা বেদের অধিকারকে অতিক্রম করে নিত্য অনুপম আনন্দের অধিকারী। প্রেমামৃত পানে সদা উন্মত্ত বলে—চৈতন্য ভাগবতে নিত্যানন্দ প্রভুকে 'মাতালিয়া' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাস ধর্ম্ম অনুযায়ী সন্ন্যাসীগণ গিরি, পুরী, ভারতী ইত্যাদি দশ প্রকার উপাধি ধারণ করে থাকে। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেও কোন উপাধি গ্রহণ করেননি, যোগপট্টও গ্রহণ করেন নি, তিনি নিত্য অনুপম আনন্দে নিমগ্ন থাকায়—তাঁকে নিত্যানন্দ স্বরূপ বলা হ'তো।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সংসারের মায়ায় কোন ভাবেই আবদ্ধ ছিলেন না, বর্ণাশ্রমের কোন প্রতিফলনই ছিল না তার মধ্যে—তাই তিনি অবধূতও।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপম রূপ ও অফুরন্ত করুণার মূর্ত প্রতীক হয়েই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ অবতারী বা ভগবান বিধায়—তাকে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ কঠোর হ'তে হ'ত। নিত্যানন্দ প্রভু কেবল অনন্ত করুণার সমুদ্র। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনের অসীম—অনন্ত কৃপা সমুদ্রের মূর্ত প্রতীক।

নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাতেই জগাই মাধাই উদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া গৌরতত্ত্বের সমুদ্রে অবগাহন সম্ভব নয়। তাই গৌরভক্তগণ সর্ব্বদা নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অকৃপণ করুণা ধন্য।

অদৃশ্যও অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবানকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই পরম করুণায় জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে চিনিয়ে দিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচল থেকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে বহু মানুষকে শিষ্যত্ব প্রদান করে—পরমার্থের অধিকার দেন। নিত্যানন্দ প্রভু যেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অফুরন্ত অনুগ্রহের ভাবমূর্ত্তি। নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবানের করুণা লাভে পাপী-তাপী নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ ধন্য হয়েছে।

নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌরভক্তগণ দ্বাপরের 'বলরাম' রূপে স্বীকার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তিনি একচাকা গ্রামে অবতীর্ণ হন্। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হন—অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে এরূপ উল্লেখও রয়েছে। দ্বাপর লীলায় রোহিনী বলরামের মাতা ছিলেন। গৌরাঙ্গ লীলায় সেই রোহিনীই যেন পদ্মাবতী। দ্বাপর লীলায় বলরামের বারুণী ও রেবতী নামে দুই পত্নী ছিলেন—গৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দের

দুই পত্নী রূপে তাঁরা আবির্ভূতা। বারুণী বসুধা রূপে এবং রেবতী জাহ্নবী রূপে এসেছিলেন।

পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসও তাই বলেছেন—

হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
গৌর কীর্ত্তন রসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে ।।
"ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচী সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।"
দীন হীন যত ছিল' হরিনামে উদ্ধারিল
সাক্ষী তার জগাই মাধাই ॥

নরোত্তম দাসও বললেন, নবতর ভাব ব্যঞ্জনার মাধ্যমে—

নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
বলরাম আপনি নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ।।

ভগবানকে তাঁর কৃপা ছাড়া জানা যায় না। শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠন-ব্যাখ্যানেও তাঁকে জানা সম্ভব হয় না, যদি তিনি কৃপা করে নিজেকে না জানান।

লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে ।।

* * *

"কেহ কি তাঁহারে জানিতে পারে।
যদি তিঁহ না জানান আপনারে ।।
ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয়তো যাহারে।
সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে ।।

* * *

কে তোমারে জানিতে পারে;
তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত;
খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে ।।

মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ল্লভ হ'লেও, দেহধারী ব্যক্তি বা বস্তু মাত্রেই ক্ষণভঙ্গুর। সবচেয়ে দুর্ল্লভ ঈশ্বরের প্রিয়জন বা কৃপাধন্য ব্যক্তির দর্শন পাওয়া।

ভগবানের প্রিয়জনের মাধ্যমে তাঁর কৃপা সাধারণ মানুষের উপর বর্ষিত হয়ে থাকে!

শ্রীগৌর-লীলার আদি ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর মনের কথা উপলব্ধি করে শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনার প্রথম পর্য্যায়েই ভক্ত পূজার আদর্শ প্রচার করেছেন। নিম্নোক্ত শ্লোকেই বলা হয়েছে করুণার মহাসমুদ্র নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাতেই গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব।

"আছে শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ প্রকার মোর দণ্ড পরিণামে॥
তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপ অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥
'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দৃঢ়॥
এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের-বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ॥
ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের কৃত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥

—চৈঃ ভাঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবান নিজেকে শুধু 'ভক্তের ভক্ত' বলেই ক্ষান্ত হননি, আপন আচরণের দ্বারাও প্রমাণ রেখেছেন—

'নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধূতি-বস্ত্র তুলি কারো দেন ত' আপনে॥
কুশ, গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোনদিন চলে কারো ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে।
'কি কর', 'কি কর!' তবু করে বিশ্বম্ভরে॥

এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন-দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২য় অঃ

তিনি স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম হয়েও দাসাভিমানে ভক্তগণের মহিমা স্তুতি করেছেন—

'তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥'
'তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।'

চৈঃ ভাঃ মঃ

শুধু নিজে আচরি শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃপ্ত হ'লেন না, শ্রীমুখ বচনেও বললেন—

"সেবক করিয়া মোরে সবাই জানিবা।"

অন্য সকলকেও তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন—

"ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতামাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার॥"

—চৈঃ ভাঃ অঃ ১ অঃ

"মোর ভক্তপ্রতি প্রেম ভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে॥"

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৬ অঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার আচরণ-মুখেও প্রচার করেছেন—

"কৃষ্ণ সেবা হৈতেও বৈষ্ণব সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ়॥
এতেক বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্য সিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩অঃ

"কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
যে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥

—চৈঃ চঃ অ ম ২অঃ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রূপকার শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভুও বলেছেন—

"চৈতন্যের দাস মুই, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুই, তাঁর দাসের দাস॥"

ঠাকুর নরোত্তম সেই একই কথা বললেন—

যদি থাকে বহুধন, নিজে হবে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর সমাদর।'

শ্রীগুরুবৈষ্ণবই শ্রীভগবানের সেবাভিজ্ঞ। তাঁদের আনুগত্য গ্রহণ করেই শ্রীভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

'এত শুনি' প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
'মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল॥
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।'

—চৈ চঃ অ ৩ পঃ

যে সকল মহাপুরুষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণা, প্রেম ও গভীর ভক্তি দ্বারা তার পরিকর হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন—ভক্ত হরিদাস তাঁদের অন্যতম।

ভক্ত হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সহচর। নানাবিধ উৎপীড়ন ও অত্যাচারও—তাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাকে টলাতে পারে নি।

ভক্ত হরিদাস যশোর জেলার বুঢ়্যন গ্রামে (বর্ত্তমান বনগাঁর নিকটবর্ত্তী স্থানে) এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন্। অসহায় ও অনাথ বালক হরিদাসকে এক দয়ার্দ্র মুসলমান দম্পতি সযত্নে লালন-পালন করেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের হরিনামে জন্মগত বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও হরিভক্তি স্বতর্ফূতঃভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

তিনি উচ্চৈঃস্বরে অবিরত হরিনাম-সংকীর্ত্তন করতে থাকেন। পাড়া প্রতিবেশীরা তাঁকে বারবার উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে নিষেধ করলেন---কিন্তু ভক্ত হরিদাস তাঁর বিশ্বাসে অবিচল থেকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন।

পাড়া-প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়ে হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে নালিশ করল। কাজীর আদেশে হরিদাস হরিনাম কীর্ত্তন বন্ধ করলেন না। তিনি পূর্বের মতোই উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করতে লাগলেন। ফলে কঠোর নির্য্যাতন ও অত্যাচার সইতে হ'লো ভক্ত হরিদাসকে। কিন্তু ভক্ত হরিদাস তবু হরিনাম কীর্ত্তন বন্ধ করলেন না।

"ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাস দুঃখ বড় পায়েন অন্তর ॥
তথাপিহ হরিদাস উচ্চৈঃস্বর করি।'
বলেন প্রভুর সংকীর্ত্তন মুখ ভরি ॥'
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপীগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ হরি সংকীর্ত্তন ॥
হরিনদী গ্রামে এক দুর্জ্জয় ব্রাহ্মণ।
হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন ॥
'অরে হরিদাস, একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার ?
মনে মনে জপিবা,— এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয় ?
কার শিক্ষা—হরিনাম ডাকিয়া লইতে ?
এই ত' পণ্ডিত সভা, বলহ ইহাতে ॥"
হরিদাস বলেন,— ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান, হরিনামের মহত্ব ॥
তোমরা সভার মুখে শুনিঞা সে আমি।
বলিতেছি, বলিবাঙ যেবা কিছু জানি ॥
উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষত না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয় ॥

* * *

'উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ।'

বিপ্র বলে—'উচ্চনাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ পুণ্য হয় কি হেতু ইহার ?
হরিদাস বলেন,—'শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার, বেদে ভাগবতে কয় ॥'
সর্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে ॥
'শুন বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় বৈকুণ্ঠ ধাম ॥

*　　　　*　　　　*

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মামেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥

—ভাঃ ১০।৩৪।৪১

সর্পদেহ প্রাপ্ত সুদর্শন নামক বিদ্যাধর শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে নিজরূপ প্রাপ্ত হয়ে বললেন—যাঁর নাম কীর্ত্তন করে ব্যক্তিমাত্রই সমস্ত শ্রোতা এবং নিজেকে সদ্য পবিত্র করে থাকেন, সেই আপনার সাক্ষাৎ পদস্পর্শে পবিত্র হয়ে সে ব্যক্তি যে সর্ব্বতোভাবে শোধন করবে এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

ভক্ত হরিদাস সেই ব্রাহ্মণকে আরও বললেন—

শুন বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥

[হরিনাম মনে মনে জপ করে কেবলমাত্র জপকারী ব্যক্তিই আনন্দলাভ করে—কিন্তু হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করলে জন্তু এবং গুল্মলতাদিও সেই নাম শ্রবণে পবিত্র হয়ে থাকে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী জিহ্বা লাভ করেও হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে অসমর্থ। তাই জীবজন্তু নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি অসীম করুণায় ভক্ত হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতেন।]

জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা অন্যপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি,—কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে?
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় 'শুণ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে'॥

সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চকরি' কীর্ত্তন গাহিয়া॥ —চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অঃ

অত্যাচার, অপমান, নির্য্যাতন—কোন কিছুতেই ভক্ত হরিদাস হরিনাম বন্ধ করেন নি। তাঁর বিশ্বাস টলানো যায় নি। সাধারণ জীব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির প্রতি তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহকে নিঃশেষ করতে পারেনি। বরং অত্যাচারীদের শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। তাঁর হরিনামে অবিচল নিষ্ঠা, অনুপম তিতিক্ষা এবং অচিন্ত্য ভক্তি দেখে আবালবৃদ্ধবনিতাগণ সকলেই শেষ পর্য্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন।

এমন কি স্বয়ং কাজী তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে অন্যত্র চলে যেতে অনুরোধ করলেন।

হরিদাস তাঁর জন্মস্থান ত্যাগ করে দূরবর্তী কোন এক গ্রামে (বর্তমান বেনাপোলের প্রান্তে) জঙ্গলের ধারে একটি কুটির তৈরী করে আত্মানন্দে মগ্ন হয়ে প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে তিন লক্ষ বার হরিনাম গ্রহণ করতে লাগলেন।

'বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
তিনলক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ-ভবন॥'—চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অঃ

তাঁর হরিনাম নিষ্ঠা, ত্যাগ, অনুপম তিতিক্ষা ও ভক্তির কথা ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অসংখ্য নরনারী তাঁকে দর্শন করতে এলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করতে লাগলেন সকলেই। হরিদাসের খ্যাতি তথাকার জমিদার রামচন্দ্র খাঁর অন্তরে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে তুলল। সংসারে এমন লোক যথেষ্ট রয়েছেন —যারা অপরের খ্যাতি বা প্রশংসা সহ্য করতে পারেন না। রামচন্দ্র খাঁ সেই প্রকৃতিরই লোক ছিলেন।

ভক্ত হরিদাসের সুনাম ক্ষুণ্ণ করে তাঁকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য রামচন্দ্র খাঁ তাই তৎপর হ'লেন। তিনি একজন দুষ্ট-স্বভাবা স্ত্রীলোককে এ ব্যাপারে কাজে লাগালেন। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের প্ররোচনায় ও আর্থিক প্রলোভনে বশীভূতা হয়ে ঐ বারবণিতা তাঁকে বিপথগামী করার মানসে একদিন গভীর রাতে হরি-দাসের কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হলো।

ভক্ত হরিদাস তখন উচ্চৈঃস্বরে একাগ্র চিত্তে হরিনাম করছিলেন, বারবণিতা ভেতরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল। হরিদাস চোখ মেলে তাকিয়ে তাকে বাইরে বসতে বললেন।

'তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন॥
এত শুনি' সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন ক'রে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥

—চৈঃ ভা অঃ ৩।১১৪-১৫

মায়াদেবীও তাঁকে ছলনা করতে উপস্থিত হ'লে ভক্ত হরিদাস মায়াদেবীকেও বলেছিলেন—

'যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে' বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে, করিমু তব প্রীতি আচরণ॥
এত বলি' করেন তেঁহো নাম সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি' করে শ্রীনাম-শ্রবণ॥

—চৈঃ চঃ আ ৩।২৩৯-২৪১

রামচন্দ্র খাঁ প্রেরিত বারবণিতাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে—হরিদাস হরিনামে তন্ময় হয়ে রইলেন।

ঐ স্ত্রীলোকটি বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সে মনে মনে ভাবল—সাধু হরিনাম সংকীর্ত্তন শেষ করেই তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলবেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, হরিদাসের নাম সঙ্কীর্ত্তন শেষ হ'ল না, তাই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলারও অবকাশ পেলেন না। পরিশেষে ঐ স্ত্রীলোকটি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল, সে বিরক্ত হয়ে হরিদাসের সামনে উপস্থিত হয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল।

হরিদাস পুনরায় তাকে হরিনাম কীর্ত্তন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। রাত ভোর হয়ে গেল, তবুও হরিদাসের হরিনাম লওয়া শেষ হ'লো না—ভোরবেলা স্ত্রীলোকটি নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েও সে আবার রাতের বেলা হরিদাসের কাছে এল। এইরূপে পর পর তিন রাত অতিক্রান্ত হ'লো—হরিদাস নিজের আসনে বসে যথারীতি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করতে লাগলেন। স্ত্রীলোকটির উপস্থিতি তাঁর মধ্যে কোন বিকারের সৃষ্টি করতে পারল না। বরং হরিনাম শুনতে শুনতে স্ত্রীলোকটিরই মানসিক পরিবর্তন ঘটল। সে তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু হরিদাসের নির্ম্মল চিত্তে কোনরূপ বিকার জাগানো সম্ভব হয় নি। মুনিদেরও নাকি মতিভ্রম হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্ত হরিদাসের মতিভ্রম হ'লো কই? তিনি সারারাত একাসনে বসে তন্ময়ভাবে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপ করতে লাগলেন।

হরিনামে তাঁর নিষ্ঠা ও অবিচল আত্মবিশ্বাস দেখে—স্ত্রীলোকটিই গভীর শ্রদ্ধায় নত হ'লেন।

নিজের কলঙ্কিত জীবনের প্রতি ধিক্কার জাগল। এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য সে পরিশেষে বিশেষ ভাবে অনুতাপ করতে লাগল। ভোরবেলা যখন হরিদাস হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সমাপ্তে আসন ছেড়ে উঠলেন—স্ত্রীলোকটি তখন তাঁর পায়ে পড়ে আকুলভাবে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই সে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইল।

হরিদাস নিজগুণে তাকে ক্ষমা করলেন। শুধু ক্ষমা করেই ক্ষান্ত

হলেন না, সেই পতিতা নারীকেও কৃপা করলেন। তিনি সুমধুর বাক্যে পতিতা স্ত্রীলোকটিকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন—সদ্‌ভাবে জীবন যাপন কর। আর হরিনাম জপ কর। কোন পাপই স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে আর।

'নিরন্তর নাম লহ, তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ —চৈঃ চঃ

পতিতা অভাগিনী সেই স্ত্রীলোকটি তাঁর কৃপাধন্যা হ'লেন। জন্ম জন্মান্তরের দুর্ভাগ্য বিদূরিত হ'লো। হরিদাসের কৃপাতেই তিনি হরির কৃপা লাভ করলেন। পরবর্তীকালে পরম সৌভাগ্যবতী সেই মহিলা তার নিন্দিত স্বভাব পূর্বের চাল-চলন ত্যাগ করলেন। তার যা বিষয় সম্পত্তি ছিল গরীব-দুঃখীদের দান করে 'মহান্তী বৈষ্ণবী' রূপে অতি দীনভাবে জীবন-যাপন করতে লাগলেন। এবং ভজন-সাধনের মাধ্যমে দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

'তুলসী সেবন করে চর্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥

এ ঘটনার পর হরিদাসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লো। দলে দলে তারা হরিদাসের কুটিরে এসে ভীড় করতে লাগল।

জনসাধারণের ভীড়ে সাধন-ভজন বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনায়—হরিদাস স্থানত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন।

তাঁর পরিত্যক্ত কুটিরে এসে তখন সেই 'মহান্তী বৈষ্ণবী' বাস করতে লাগলেন। সেই বৈষ্ণবী ঐ কুটিরেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কঠোর সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেছিলেন।

ঐ স্থান ত্যাগ করার পর হরিদাস পরিব্রাজকের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি তিন লক্ষবার উচ্চৈঃ-স্বরে হরিনাম গ্রহণ করতেন। পরিব্রাজক অবস্থায়ও তাঁর সেই বিস্ময়কর নিষ্ঠা সম্পূর্ণ অটুট ছিল।

নানা দেশ ঘুরে ঘুরে তিনি শেষ পর্য্যন্ত শান্তিপুরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন এবং গঙ্গাতীরে একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে অনুপম-আনন্দে ভজন-সাধনে মগ্ন হলেন।

সেই সময়ে শ্রীমদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরে বাস করতেন। হরিদাসের সন্নিধ্য পেয়ে শ্রীমদ্বৈত আচার্য্যের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি ভক্ত হরিদাসকে শান্তিপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অনুরোধ জানালেন। এবং অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং গঙ্গাতীরে একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে হরিদাসের অবস্থানের জন্য একটি গোঁফা নির্ম্মাণ করে দেন। এবং অদ্বৈত প্রভুই হরিদাসের অন্ন বস্ত্রাদি যোগাতে লাগলেন। হরিদাসও অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে ভগবদ্ আলোচনায় পরম তৃপ্তি লাভ করে গঙ্গাতীরের সেই গোঁফায় বাস করতে লাগলেন। হরিদাসের অবস্থানের ফলে শান্তিপুর ধন্য হ'লো।

হরিদাসের বিনম্র স্বভাব, হরিনামে নিষ্ঠা এবং তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা শান্তিপুরের রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের মধ্যে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনল। তারা ক্রমশঃ সংস্কার মুক্ত ও উদার হ'লেন। অদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন।

শান্তিপুরে বসবাস কালেই করুণার মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহিমা, প্রেমভক্তি ও নাম কীর্ত্তনের কথা হরিদাস শুনতে পেলেন। অদ্বৈত প্রভুর মুখেও সেই সনাতন পুরুষের বিশেষ পরিচয় পেলেন। হরিদাস আর স্থির থাকতে পারলেন না—নবদ্বীপে এসে মহাপ্রভুর শরণ নিলেন। ভক্ত হরিদাসের সান্নিধ্য পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুও অনুপম আনন্দলাভ করলেন।

শান্তিপুরে অবস্থান কালে হরিদাস একবার কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়াতেও গিয়েছিলেন। হরিদাসের আদর্শ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ফুলিয়াবাসী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামদাসের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি হরিদাসকে ধর্ম্মাচার্য্য বলে অবনত মস্তকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁকে নামাচার্য্য আখ্যা দিয়ে থাকেন।

কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় শান্তিপুর ডুবুডুবু হয়েছিল—আর নদে' ভেসে যাচ্ছিল। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভু আর হরিদাসের অবস্থানের ফলে—প্রেম প্লাবনে প্রায় ডুবুডুবু হয়েছিল, স্বয়ং মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ প্রভু পরিকরগণ সহ নবদ্বীপে অবস্থান করায়—নদে ভেসে যাচ্ছিল। হরিদাস নবদ্বীপে যেতেই প্রেমসাগরে যেন তুফান উঠল। মহাপ্রভু যেন দীর্ঘদিন হরিদাসের আগমন প্রতীক্ষা করে রয়েছিলেন, হরিদাসকে কাছে পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উথলে উঠল।

নিত্যানন্দ প্রভু আর হরিদাস পরস্পরের অন্তরঙ্গ হ'লেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছানুসারে তাঁরা দু'জন নবদ্বীপের সর্ব্বত্র এবং নবদ্বীপের উপকণ্ঠে ঘুরে ঘুরে অধম, পতিত, অবহেলিত জনসাধারণের মধ্যে হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করতে লাগলেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে তাঁরা দু'জন পরমার্থের অধিকার প্রদান করলেন। তাঁরা ভিক্ষুক হয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে লাগলেন। অর্থ নয়, তণ্ডুল নয়—কৃষ্ণ নাম লও। হরিনাম লও। আর সদ্‌ভাবে জীবন যাপন কর। এই প্রতিশ্রুতি ভিক্ষা দাও। আর কিছু চাই না আমরা।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নন্যথা কল্পতে কচিৎ॥

—ভাঃ ১৩৮।৪

নন্দমহারাজ গর্গ মুনিকে বলেছিলেন—হে ভগবন্! দীনচেতা গৃহী লোকদের নিত্য মঙ্গল বিধানের জন্য মহৎ ব্যক্তিগণ তাঁদের গৃহে যান্, অন্য কারণে নয়।

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

—চৈঃ চঃ ম ৮ প

হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভুও মহান্ত স্বভাব-সম্পন্ন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে হরিনাম বিলাতেন। সঙ্কীর্ত্তনের তাদের নিজেদের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিত্য অনুপম আনন্দলাভ করেও লোকের মঙ্গলের জন্য

তাঁরা ভিক্ষুক সেজেছিলেন। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাকেই প্রেমালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে হরিনাম নিতে অনুরোধ জানালেন। অর্থ নয়, তণ্ডুল নয় —হরিনাম কর। বল গৌর হরি।

"যারে দেখে তারে বলে করযোড় করি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥

জীবের প্রতি মহাপ্রভু এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পরিজনদের—এ অফুরন্ত অনুগ্রহে সকল শ্রেণীর লোকদের মনে এক নূতন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ ক্ষেত্রে পুরীধামে অবস্থান করছিলেন, মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করার তীব্র আকাঙ্খায় হরিদাসও তাই পুরীধামে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এবং দীর্ঘদিন পুরীতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে কুঠিয়াতে অবস্থান করে হরিনাম কীর্ত্তন ও ভগবদ্ ভজনে দিনাতিপাত করতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং প্রতিদিন তাঁর কুঠিয়াতে উপস্থিত হয়ে খোঁজ খবর নিতেন এবং মন্দির থেকে প্রসাদ এনে দিতেন। মহাপ্রভু তাঁর সেবক গোবিন্দের ওপর প্রতিদিন হরিদাসকে মহাপ্রসাদ খাওয়াবার ভার অর্পণ করেছিলেন।

বৃদ্ধাবস্থায়ও হরিদাস তিনলক্ষ বার উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গ্রহণ করতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন হরিদাসের প্রেমভক্তিতে, নিষ্ঠায় ও বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে অন্যান্য অন্তরঙ্গ পরিকরগণের সামনেই হরিদাসকে বলতেন :—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে তুমি কর সর্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন॥ —চৈঃ চঃ

হরিদাসের হরিনামে অনুরাগ ও তন্ময়তার কথা মহাপ্রভু আপন পরিকরগণের সামনে বারবার তুলে ধরতেন—

কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয় ।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফলে নহে ।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥
ভক্তিসুখ আগে, মুক্তি অতি তুচ্ছ হয় ।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয় ॥ —চৈঃ চঃ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীও হরিদাস সম্বন্ধে বলেছেন—

'হরিদাস, তোমার মতো শুদ্ধচরিত আদর্শবান তপস্বী কে আছে ?

মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান ॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন ।
সবার আগে কর নামের মহিমা-কথন ॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার ।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার ॥
আচার প্রচার নামের দুই কার্য্য ।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥ - চৈঃ চঃ

ভক্ত হরিদাসের মহাপ্রয়াণের কিছু আগে মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ নিয়ে তাঁর কুঠিয়াতে প্রবেশ করে দেখলেন, তিনি শুয়ে শুয়ে সংখ্যা-নাম (হরিনাম) জপ করছেন। গোবিন্দ তাঁকে উঠে বসে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন। ভক্ত হরিদাস গোবিন্দকে বললেন, মহাপ্রসাদ তাঁর মাথায় ঠেকিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কারণ মহাপ্রসাদ গ্রহণের যোগ্য সে নয়।

ভক্ত হরিদাসের কথা শুনে গোবিন্দ খুবই বিচলিত বোধ করলেন। বারবার তাঁকে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু হরিদাস কিছুতেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন না। মহাপ্রসাদ তাঁর মাথায় ঠেকিয়ে ফিরে এলেন সেবক গোবিন্দ। এবং ফিরে এসে

দুঃখভারাক্রান্তচিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সব কথা বললেন। সে কথা শুনে মহাপ্রভুও ব্যস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে হরিদাসের কাছে ছুটে এলেন।

'কি ব্যাপার হরিদাস ? শারীরিক কুশলতো ?"

হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করে বিনম্রচিত্তে এবং বিমর্ষ ভাবে বললেন ; প্রভু, আমার শরীর ভালই আছে, কিন্তু মন-বুদ্ধি ভাল নয়, আজ যে আমার জপের সংখ্যা পূর্ণ হয়নি—কি করে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করি ?

হরিদাসের কথা শুনে করুণা ও প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন ঃ হরিদাস তোমার বয়েস এখন বেশী, শরীর দুর্বল ও অক্ষম। এই অবস্থায় তোমার আর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপের প্রয়োজন নেই। যতটুকু তোমার সাধ্যে কুলায়—ততটুকু নাম গ্রহণ করলেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি তো চিরশুদ্ধ নিষ্ঠাবান তপস্বী, এই বয়েসে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার আর তোমার প্রয়োজন নেই।

করুণার মহাসমুদ্র স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুমধুর বাণী শুনে হরিদাস করযোড়ে তাঁকে বললেন—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও তুমি যৈছে ইচ্ছা হয়॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিতে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥ —চৈঃ চঃ

হরিদাস তাঁর মনের শেষ কথাই নিবেদন করলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছে। হরিদাস বিদ্যমান থাকতে—শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করবেন

—এ দুঃখ সইতে পারবেন না তিনি। তিনি যেন শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যমান থাকতে থাকতেই তাঁর কমল চরণ হৃদয়ে ধারণ করে, নয়নের মাধ্যমে তাঁর অনুপম রূপ দর্শন করতে করতে এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে মহাপ্রস্থানের পথ ধরে চলে যেতে পারেন।

ভক্ত হরিদাসের অন্তিম ইচ্ছা উপলব্ধি করে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে প্রেমালিঙ্গন করলেন এবং পরদিন সকালে তাঁকে দর্শন দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন।

প্রতিশ্রুতি মত পরদিন সকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে হরিদাসের কুঠিয়াতে উপস্থিত হ'লেন। হরিদাসকে মধ্যস্থলে বসিয়ে—সকলে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে লাগলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং ভক্তগণ সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রাধাভাবে তন্ময় হয়ে কীর্ত্তন করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই মহাসঙ্কীর্ত্তন চলল। তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত হরিদাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভক্ত হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের রাতুল চরণ প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত করে পরমানন্দে হৃদয়ে ধারণ করলেন। তাঁর দৃষ্টি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুপম মুখচন্দ্রে নিবদ্ধ হ'লো এবং তাঁর কণ্ঠ হ'তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারিত হ'তে থাকল। নাম উচ্চারণ করতে করতেই নামাচার্য্য মহাপ্রস্থানের পথ ধরলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বারবার।
প্রভু-মাধুরিতে পিয়ে নেত্র জলাধার॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করে উৎক্রামণ॥

--চৈঃ চঃ

অনেক ভক্ত বৈষ্ণবগণ ভক্ত হরিদাসকে ব্রহ্ম হরিদাস আখ্যা দিয়ে থাকেন। এবং তাঁরা মনে করেন হরিদাসই স্বয়ং ব্রহ্মা।

দ্বাপরেতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে ব্রহ্মার ভ্রম হয়েছিল। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, ভগবন্মায়া শুধুমাত্র মর্ত্ত্যবাসী জীবগণের ওপর

পাতাওর

প্রভাব বিস্তার করে ক্ষান্ত নয়, দেবগণের ওপরেও ভগবন্মায়া স্বপ্রভাব বিস্তারে সমর্থ। এবং সেই ভগবন্মায়ার প্রভাবেই লোক পিতামহ স্বয়ংই গোপতনয় এবং গো-বৎস হরণ করেছিলেন। সেই জন্যেই তাঁকে মর্ত্ত্যধামে হরিদাস রূপে আসতে হয়েছিল, এবং ধেনু-বৎসাদি হরণ করার অপরাধে যবন গৃহে প্রতিপালিত হ'তে হয়েছিল।

স্বয়ং ব্রহ্মা ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ—ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠা অসম্ভব।

অবশ্য বৈষ্ণবগণের এ বিশ্বাসের মূলে কি ?—তা' আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি—এক্ষেত্রে তর্ক অবান্তর।

"বিশ্বাসে মিলয় বস্তু, তর্কে বহুদূর।"

কারণ শ্রীভগবানের সকল লীলাই তাঁর অচিন্ত্য প্রভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। তর্ক করা বৃথা !

——

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, তাঁর দার্শনিক মতবাদ, তাঁর প্রবর্ত্তিত প্রেম ধর্ম্ম—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানুষ জাতির ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদ বিশেষ। তাঁর শিক্ষা জাগতিক মানুষকেও মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করে। গৌরকথা শ্রবণ মাত্রেই—অন্তরের মালিন্য দূর হয়, জন্ম, মৃত্যু, হিংসাদ্বেষ সমন্বয় বিক্ষিপ্ত চিন্তাজনিত কারণে হৃদয়ে যে কাঠিন্য জেগে ওঠে—সেই কাঠিন্যকে বিগলিত করে কোমলতা জাগিয়ে তোলে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহটি যেমন অনুপম, তেমন অফুরন্ত তাঁর অনুগ্রহ। তুলনা রহিত এবং অভূতপূর্ব।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন তদীয় সখাগণকে বলেছিলেন :—

পশ্যতৈতান মহাভাগান পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাত বর্ষাত পহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তিনঃ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনেস্যব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥
পত্রপুষ্প ফলচ্ছায়া-মূল-বল্কলদারুভিঃ।
গন্ধ নির্য্যাসভস্মাস্থি তোক্মৈ কামান বিতম্বতে॥

—ভাঃ ১০।২২।৩২।৩৪

তোমরা একমাত্র পরোপকারের জন্য জীবনধারী মহাভাগ্যবান্ এই বৃক্ষসমূহকে দর্শন কর। এরা স্বয়ং বাত, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করে —আমাদের তৎজনিত কষ্টাদি নিবারণ করছে। এঁরা সমস্ত জীবের জীবিকা স্বরূপ—অতএব এদের জীবন ধন্য। সজ্জনগণের নিকট থেকে যেমন যাচকগণ নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে না– তদ্রূপ এদের কাছ থেকেও কোন যাচক বিমুখ হয় না। এরা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, কাষ্ঠ, পুষ্পাদিগন্ধ, নির্য্যাস, অস্থি এবং পল্লবাদির অঙ্কুর প্রদানে সকলের অভিলাষ সর্ব্বদা পূরণ করছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন তদীয় ভক্তগণের কাছে বৃক্ষের আদর্শই তুলে ধরলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমামিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

*　　　　*　　　　*

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম্।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ-সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ তবু পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনেরে করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তাঁর প্রেম-উপজয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন—উত্তম হয়েও বৈষ্ণবগণকে নিরভিমান হ'তে হবে। এমন কি দীনতার অভিমানও থাকবে না তাঁদের। বৃক্ষ অপেক্ষাও তাঁদের আরো বেশী সহিষ্ণু এবং পরোপকারী হ'তে হবে।

এর চেয়ে বড় আর কোন মানবিক-ধর্ম্মের কথা আমার জানা নেই। বৈষ্ণব হওয়া সহজ কথা নয়। কোন ভণ্ড যদি বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করে—সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে দোষী করা চলে না নিশ্চয়ই। তাই বৈষ্ণবদের উপর আমাদের সকলকেই শ্রদ্ধাবান্ হ'তে হবে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ভদ্রলোক —বৈষ্ণবদের নাম শুনলেই নাসিকা কুঞ্চন করেন, ফোঁটা তিলক কাটা বলে উপহাস করেন। আমাদের সাহিত্যে—অর্থাৎ নাটকে, উপন্যাসে বৈষ্ণবদের নানা ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বিদ্যমান।

তাঁদের আমি বলি—বৈষ্ণব বা সাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হ'ন। কারণ বৈষ্ণবাপরাধ -এক গুরুতর অপরাধ। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণবগণের

হৃদয়ে আঘাত হানলে—সেই আঘাত বিশ্বাত্মার হৃদয়েই চরমভাবে আঘাত হানে।

এবং তাদের আমি বলি—মহাপ্রভুর শিক্ষা নীতিমূলক ও যুক্তিমূলক—এবং মানবিক আদর্শযুক্ত এমন শিক্ষা শুধুমাত্র তুলনা রহিত নয়—ধর্ম্মকে যারা আফিংয়ের নেশা আখ্যা দিয়ে থাকেন, মানবিক কল্যাণের খাতিরে তাঁদের অনুধাবনযোগ্য।

সেই সঙ্গে সকল বৈষ্ণবের চরণ স্মরণ করে—আমার একটা ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে যাই—'কত জন্ম পরে ঈশ্বরের করুণা পাব জানিনা, কিন্তু জন্ম জন্মান্তরে আমি যেন সকল বৈষ্ণবের চরণে শ্রদ্ধা জানাতে পারি। যখন যেখানে যেভাবেই আমার জন্ম হোক—আমি যেন সাধু বা বৈষ্ণবগণের দাসানুদাস হয়ে—তাঁদের সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণকে শুধুমাত্র বৃক্ষের চেয়ে সহিষ্ণু বা পরোপকারী হ'তে বলেই ক্ষান্ত হন্ নি আরো কিছু বলেছেন—

দেহের অভ্যন্তরে যে বায়ু ক্রিয়া করে তার নাম প্রাণ। দেহকে ধারণ করে রাখার নিমিত্ত প্রাণ কেবলমাত্র আহার্য্য চায়, আহার্য্যের আস্বাদ চায় না। বৈষ্ণকগণ তাই রসাসক্তি ত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণধারণের নিমিত্ত আহার করবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই বললেন—

"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।

*   *   *

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥

*   *   *

শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥

*   *   *

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ —চৈঃ চঃ অঃ ৬ পঃ

একাশি

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণ জীবের প্রতি তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহ বিতরণ করলেও—আবার তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন অসহযোগী মনোভাব সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। নিজের সঙ্গী ছোট হরিদাসের বর্জ্জনের মধ্যে তাঁর যে ক্ষমাহীন দৃপ্ত কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে—তা আমাদের সকলেরই অনুধাবনযোগ্য। সেই কঠোরতার মহান্ আদর্শ বর্তমান যুগেও আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রেরণা যোগায়। মানবিক মূল্যবোধকে উর্দ্ধে তুলে রাখার জন্য প্রেম ও করুণার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীমন্মাপ্রভু যে কত নির্ম্মম ও নিষ্করুণ হ'তে পারেন ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করেই তা তিনি আচরণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ছোট হরিদাস নামে নবদ্বীপে একজন গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ছিল। তজ্জন্য তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। এই ছোট হরিদাসের কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভু অপার আনন্দ লাভ করতেন। নীলাচলেও এই ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে তাঁকে কীর্ত্তন শোনাতেন। মহাপ্রভুও ছোট হরিদাসকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন।

এই ছোট হরিদাস একদিন পরম তপস্বিনী মাধবী দাসীর কাছ থেকে স্বীয় ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল পরিবর্তন করে উত্তম চিক্কন চাল (তণ্ডুল) গ্রহণ করেছিলেন। প্রেম ও করুণার মূর্ত অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু—এই অপরাধে ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করেন।

পুরী গোস্বামীর অনুরোধেও শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করেন নি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আচরণের কথা অনুধাবন করলে বিস্ময়ান্বিত হ'তে হয়। যিনি অদৃশ্য ও অব্যক্ত হয়েও জীবের প্রতি করুণাবশে প্রকট হয়েছেন, যিনি পথে পথে ঘুরে ঘুরে মায়ামুগ্ধ জীবের জন্য আকুল হয়ে ক্রন্দন করেছেন—

'উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।'

সেই মহাপ্রভুই আবার সামান্য অপরাধে কতখানি নির্ম্মম ও

নিষ্করুণ হ'য়ে—আপন সঙ্গী ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করলেন। শ্রীভগবানের মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মেরও সমন্বয় সম্ভব। তিনি যেমন দয়ালু, আবার তেমনি কঠোর। লোকহিতের জন্য, মানবিক মূল্যবোধের উচ্চাদর্শ বজায় রাখার জন্য করুণার মহাসমুদ্র আবার যেন নিমেষের মধ্যে কঠিন পর্ব্বতে রূপান্তরিত হলেন। তাঁর এই গূঢ় লীলা উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

ছোট হরিদাস প্রয়াগ তীর্থে গিয়ে ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রাণত্যাগ করেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে খোলবাদ্যের প্রচলন করে—ছোট হরিদাস বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত হয়েছিলেন।

ভক্ত হরিদাস, ছোট হরিদাস ব্যতীতও বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে আরও কয়েকজন হরিদাসের উল্লেখ রয়েছে। নিত্যানন্দ শাখার হরিদাস, গদাধর শাখার হরিদাস এবং দ্বিজ হরিদাস।

সম্ভবত দ্বিজ হরিদাসই পণ্ডিত হরিদাস নামে অভিহিত হন্।

চৈতন্য চরিতামৃতে যে পণ্ডিত হরিদাসের উল্লেখ রয়েছে, সেই তিনিই শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন—

"সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তার যশোগুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ ॥

দ্বিজ হরিদাস ফুলিয়ার মুখটী নৃসিংহের সন্তান। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ও গৌরগত প্রাণ ছিলেন।—মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনেই দেহরক্ষা করেন।

অদ্বৈতপ্রভু দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বলেছেন—

"মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধদাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ।।"

—চৈঃ ভাঃ ম ১৯ অঃ

কোটি কোটি মানুষের দুঃখে বিচলিত হয়ে শান্তিপুরের এই

মানুষটিই ভূমাকে ভূমিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বান শ্রীভগবান উপেক্ষা করতে পারেন নি, ভূমার আসন টলে গিয়েছিল। অদৃশ্য এবং অব্যক্ত হয়েও শ্রীভগবান পরম করুণায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে দিব্যসিংহ নামক এক রাজা ছিলেন। নরসিংহ মিশ্রের পৌত্র কুবের আচার্য্য রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। কুবের আচার্য্যের পত্নী নাভাদেবী। ১৩৫৫ শকের মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে নাভাদেবীর গর্ভসিন্ধু থেকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ধরণীধামে অবতীর্ণ হন।

শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যের পূর্বনাম—কমলাক্ষ আচার্য্য। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্র বা নরসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের বাদশাহ গিয়াসুদ্দীনের পৌত্রের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বাদশাহের কাজে প্রথমে শান্তিপুরে আসেন, পরবর্ত্তীকালে শান্তিপুরে বসবাস করেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত বিধায়, তাঁকে 'দেব-পঞ্চানন' উপাধি প্রদান করা হয়। অনেকে বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু বেশ কিছুদিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অধীনে শাস্ত্রাদি অনুশীলন করেন—এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দুই পত্নী—সীতাদেবী ও শ্রী। সীতাদেবী তাঁর পত্নী বিধায়— অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও পদকর্ত্তাগণ তাঁকে সীতানাথ আখ্যা দিয়েছেন।

"তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রী নাম্নী দুই ॥
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ।
মহাপ্রভু প্রতি যার স্নেহের বিলাস ॥"

———

পঞ্চম অধ্যায়

হরি হরি কি মোর করম অতিমন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ   না ভজিনু তিল আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ   রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ত শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সবার পাদপদ্ম   না সেবিনু তিল আধ
আর কিসে পুরিবেক সাধ ॥   —নরোত্তম দাস।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত—এই তিনজন বৈষ্ণব সমাজে প্রভু পদবাচ্য। তাঁরাই গোস্বামী পদবাচ্য, যাঁরা ইন্দ্রিয় দমনে সমর্থ হয়েছেন। গো অর্থে ইন্দ্রিয়। যারা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তাঁবাই গোস্বামী পদবাচ্য।

ছয় গোস্বামীরূপে নিম্নলিখিত ছয়জন প্রসিদ্ধ—(১) শ্রীরূপ (২) শ্রীসনাতন (৩) শ্রীজীব (৪) শ্রীগোপাল ভট্ট (৫) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট এবং (৬) শ্রীরঘুনাথ দাস। এই ছয় গোস্বামীগণকে বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্ন স্বরূপ বলে বর্ণনা করেন। এবং গৌরলীলার এই ছয় গোস্বামীগণ—ব্রজলীলায় নব মঞ্জরীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বলেই অনেক ভক্তগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, তাঁর দার্শনিক মতবাদ এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের বিকাশ সাধনে এই ছয় গোস্বামীর অবদান অনস্বীকার্য্য।

পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, মুকুন্দের পুত্র কুমার দেব এবং কুমার দেবের পুত্র শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীবল্লভ।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ১৪১০ শকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শ্রীরূপ গোস্বামী ১৪১১ শকে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বাদশাহ হোসেন শা'র দরবারে উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে রামকেলিতে অবস্থান করতেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালীন শ্রীরূপ 'সাঁকর মল্লিক' এবং শ্রীসনাতন 'দবীর খাস' উপাধি দ্বারা ভূষিত ছিলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভট্ট ব্রাহ্মণগণকে বাংলায় আনয়ন করে রামকেলীর নিকট ভট্টগ্রামে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরূপ ও সনাতন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রার সময় রূপ-সনাতনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে দু'ভাই কানাইয়ের নাট্যশালা পর্যন্ত অনুগমন করেছিলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করলে শ্রীরূপ অনুপম (অপর নাম বল্লভ) প্রয়াগে গমন করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরূপ মহাপ্রভুর আদেশেই বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন—এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। জানি না মহাপ্রভু তাঁকে এমন কি মহাধনে ধনী করলেন—যার কাছে সকল আরাম বিলাস এমন কি উচ্চ রাজপদও তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

শ্রীরূপের বৃন্দাবন যাত্রার পরে—শ্রীসনাতনেরও রাজকার্য্য আর ভাল লাগল না! তাঁর বারবার মনে হ'তে লাগল—শ্রীমন্মহাপ্রভু এমন কোন মহাধনে শ্রীরূপকে ধনী করলেন—যেজন্য শ্রীরূপ উচ্চ রাজপদ তুচ্ছ করে বৃন্দাবনে চলে গেলেন।

শ্রীসনাতন দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকলেও—রাজকার্য্য ছেড়ে কিরূপে পালিয়ে গিয়ে প্রেম ও করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হবেন—সেই কথাই ভাবতে লাগলেন কেবল। জগতে চির অনর্পিত প্রেমধনের যিনি সন্ধান পেয়েছেন—তাঁর কাছে আর তুচ্ছ রাজকার্য্য ভালো লাগবে কেন? যদিও শ্রীসনাতন বাদশাহ হোসেন শা'র অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু শ্রীসনাতনের মনোভাব বুঝতে পেরেই বাদশাহ তাঁকে বন্দী করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর

সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনাকে এভাবেই অবরোধ করে রাখতে চাইলেন।

শ্রীসনাতন কারাগারের অধ্যক্ষকে শত সহস্র মুদ্রা ও বিনম্র অনুরোধের মাধ্যমে বশীভূত করে কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন। ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে করে পরম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে ভৃত্য ঈশানকে বিদায় দিয়ে একাকী বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চললেন। কিন্তু বাধাতো আর কম নয়। পথেই দেখা হ'ল ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে। 'উচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করে কিসের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?'

শ্রীকান্ত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দেশে ফিরে গিয়ে আবার রাজ-কার্য্যে যোগদান করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু শ্রীসনাতন শ্রীকান্তের অনুরোধেও আর ফিরলেন না। শীতের পোষাক সঙ্গে নেই, শ্রীসনাতনের শীতে কম্পিত কলেবর। শ্রীসনাতন আর ফিরবেন না বুঝতে পেরে—শ্রীকান্ত তাঁকে একখানা ভোট-কম্বল উপহার দিতে চাইলেন। শ্রীকান্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি ভোট কম্বলখানা গ্রহণ করলেন এবং কাশীধামে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে শরণ নিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে ভোট কম্বলখানাও পরিত্যাগ করতে বললেন। বিনা দ্বিধায় শ্রীসনাতন ভোটকম্বলখানাও পরিত্যাগ করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে আত্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করলেন। প্রেমভক্তি ধনে মহাধনী করলেন শ্রীসনাতনকে।

পরবর্তী কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে দীন ভিখারীর মতো বসবাস করতে লাগলেন। বাইরে যিনি দীন-ভিখারী বৈষ্ণব, অন্তরে তিনি মহাধনে ধনী।

তাইতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরশমণি' কবিতায় শ্রীসনাতন সম্বন্ধে লিখলেন—'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি।...মাগি আমি তাহার খানিক ॥'

[এ প্রসঙ্গে আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা

জানাই। রবীন্দ্রনাথ যদি সেই মহাধন সম্বন্ধে অনবহিত থাকতেন— তবে অমন সুন্দরভাবে শেষের কথাটা লিখতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথকে তাই বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন বলেই মনে করি। অদৃশ্য, অব্যক্ত, অসীম ও অনন্ত সেই পরম-পুরুষ—সীমার মধ্যে এসে তাঁর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই সেই পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে বলেছেন—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে। আমার সকল অহঙ্কার ঘুচাও চোখের জলে॥' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যদি চরম ও পরম অনুভূতি সম্পন্ন না হ'তেন—তাঁর আত্ম নিবেদন সীমার গণ্ডী ছাড়িয়ে অসীম অনন্তলোকে এভাবে সাড়া জাগাতে পারত না। এবং কালজয়ী সৃষ্টি সম্ভব হ'তো না।]

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপ ও সনাতনেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বল্লভের (যাঁর অপর নাম অনুপম) পুত্র। শ্রীজীব ১৪৫৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীরই মন্ত্রশিষ্য এবং মহা পণ্ডিত।

গোস্বামীত্রয় বৃন্দাবনেই অবস্থান করে বৈষ্ণব গ্রন্থ ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ভক্তিশাস্ত্র প্রণেতা রূপে উক্ত গোস্বামীত্রয় বৈষ্ণব সমাজের শিরোমণি।

একই পরিবারের এই তিন জন কৃষ্ণকৃপা তথা গৌর কৃপাধন্য মহাপুরুষই নয়—তাঁরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিন্ন স্বরূপও।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলেছেন—

প্রভু কহে—কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমায় নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি, দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥

শ্রীগোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভট্টবারী গ্রামে ১৪২৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন

নীলাচল থেকে ভারতের বিভিন্ন তীর্থাদি পর্য্যটনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীরঙ্গমে শ্রীগোপাল ভট্টের গৃহে অবস্থান ও চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট ঐ সময় করুণা ও প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধন্য হন্ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন্। পরবর্ত্তী কালে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধারমণ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং শ্রীরূপ শ্রীসনাতন গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৫০০ শকে বৃন্দাবন থেকেই তিনি অপ্রকট হন্। শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীগোপাল ভট্টেরই মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাশীধামে শ্রীতপন মিশ্রের আবাসে দুই মাস অবস্থান করেছিলেন তখন শ্রীতপন মিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট পরম করুণাময়ের কৃপা লাভে ধন্য হন্। এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদতলেই তিনি ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশেই শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে গমন করেন ও শ্রীরূপ সনাতনের সান্নিধ্যে বৃন্দাবনে বাস করেন। এই রঘুনাথ ভট্ট প্রতিদিন এক সহস্র বৈষ্ণবকে প্রণাম করতেন, এবং একলক্ষ নাম জপ করতেন। ১৫০১ শকে তিনি অপ্রকট হন্।

সপ্তগ্রামের কায়স্থ কুলোদ্ভব গোবর্দ্ধন দাস বিরাট ধনী ব্যক্তি। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। বর্ত্তমান কালে তাকে অনায়াসেই ক্রোড়-পাতি আখ্যা দেওয়া চলে। নবদ্বীপের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোবর্দ্ধন দাসের আর্থিক আনুকূল্যের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর পুত্র। রঘুনাথ দাস ১৪২০ শকে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই রঘুনাথ দাসের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ। বিশ্বে অনর্পিত প্রেমধনের প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। পিতার সম্পদ ও লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। কেমন একটা উদাসীন বৈরাগ্য ভাব জেগে উঠে ছিল রঘুনাথের মধ্যে। রঘুনাথের মনোভাব পিতাকে বিচলিত করল।

রঘুনাথ জানতেন—'কৌমারং আচরেৎ প্রাজ্ঞ ভাগবতো ধর্ম্মান্'। কিশোর বয়েস থেকেই শ্রীভগবানে অনুরক্ত হওয়া উচিত। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেমই পরিপূর্ণতা প্রদানে সমর্থ। বিশ্বের সকল ধনসম্পদ একত্রে লাভ করলেও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিশোর বয়স থেকেই শ্রীভগবানের প্রতি অনুরক্ত হওয়া বিধেয়। বেশী বয়েসে—যখন ইন্দ্রিয় সকল ভোগশক্তি রহিত হয়ে যায়—তখন পারত্রিক কল্যাণের জন্য ভগবানকে ডাকা মানে তাঁকে উৎকোচ দিয়ে পারত্রিক কল্যাণের পথ সুগম করা। সেই ডাকার মধ্যে ভগবানের প্রতি ভালবাসা থাকে না। তাঁকে ডাকতে হ'লে কিশোর বয়েস থেকেই ডাকতে হবে। তাঁর প্রতি অনুরক্ত হ'তে হবে। তাঁকে ভালবাসতে হবে। শাস্ত্র বলেছে—'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।' যাঁদের পক্ষে স্ত্রী প্রয়োজন—তাঁদের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। অন্তরে যাঁর বৈরাগ্য আগেই জাগে, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জন্মে—তিনি আর স্ত্রী গ্রহণ করবেন কেন?

রঘুনাথের মনোভাব তাঁর পিতা বুঝতে পেরে বিচলিত হ'লেন। পরম রূপবতী এক কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন রঘুনাথের। পুত্র-বৎসল পিতা ভাবলেন—পত্নীর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে ঘরেই আটক থাকবেন রঘুনাথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর রঘুনাথ শান্তিপুরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর দর্শন লাভ করেছিলেন এবং পরম করুণাময়ের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুপম রূপ দেখেছেন—তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, পত্নীর রূপলাবণ্যে ও যৌবনে তিনি মোহিত হবেন কেন? মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে রঘুনাথ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

পিতার বিরাট অর্থসম্পদ, পত্নীর যৌবন, রূপলাবণ্য তাঁকে ঘরে ধরে রাখতে পারল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন পুরীধামে অবস্থান করছিলেন—, তাঁর মুখপদ্ম

সন্দর্শনের আশায়, তাঁর রাতুল চরণ কমলে শরণ লওয়ার জন্য রঘুনাথ উন্মত্তের মতো পুরীধামের দিকে ছুটে গেলেন।

ধনীর দুলাল, নিরুপম লাবণ্যযুক্তা পত্নীর পতি রঘুনাথ পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চললেন নীলাচলের দিকে। দ্বাদশ দিন অনবরত হেঁটে নীলাচলে উপস্থিত হ'লেন রঘুনাথ দাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ কমল দর্শন করে পথের সকল কষ্ট লাঘব হ'লো তাঁর। যাঁর চরণ কমল দর্শনে যুগযুগান্ত ধরে ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণের কষ্ট লাঘব হয়, দ্বাদশ দিনের পথচলার কষ্ট সেই তুলনায় তো অতি তুচ্ছ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কিন্তু রঘুনাথকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন: রঘুনাথ, তুমি গৃহে ফিরে যাও। মর্কট বৈরাগ্য দেখিও না।

একী বলছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু! যিনি পিতার সকল ধনসম্পদ পরিত্যাগ করেছেন, যৌবনবতী রূপলাবণ্যযুক্তা পত্নীকেও ত্যাগ করে ছুটে এসেছেন—সেই তিনি কিনা মর্কট বৈরাগ্য দেখাচ্ছেন। তবে কি তাঁর চিত্তশুদ্ধ হয়নি এখনও! মহাপ্রভুর দাসানুদাস হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করেননি এখনও!

রঘুনাথ দাস অশ্রুজলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ কমল অভিষিক্ত করে বললেন—প্রভু, আমাকে আপনি আপনার সেবার যোগ্য করে নিন। আপনার চরণে ঠাঁই দিন।

ঠাঁই পেলেন শ্রীরঘুনাথ দাস। নীলাচলে অবস্থান করে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী সহ ১৮ বৎসর কাল মহাপ্রভুর সেবা পরিচর্য্যার অধিকার পেয়ে ধন্য হ'লেন।

স্বীয় আহার সংগ্রহের জন্য ধনীর দুলাল রঘুনাথ মন্দিরের সিংহ-দ্বারের কাছে বা সন্নিকটস্থ রাজপথে পরম বিনয়ে পরম দীনতায় অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বসে থাকতেন। যে যা দিত তাই গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন। ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে জীবনধারণ করতেও দ্বিধা করলেন না রঘুনাথ। বাইরে যতই কষ্ট হ'ক—অন্তরে তিনি পরম পাওয়ার আনন্দে মগ্ন যে! কিন্তু মহাপ্রভুর পরীক্ষার শেষ হ'লো কই?

মাঝে মাঝে ভিক্ষান্নও জুটত না রঘুনাথের। পরিত্যক্ত রাজপথে পতিত মহাপ্রসাদের কণা সংগ্রহ করে ধুয়ে নিয়ে—তাই গ্রহণ করতেন তিনি শেষ পর্য্যন্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হয়ে যাওয়ার পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাকুণ্ড তীরে বসবাস করেন। সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র ৩।৪ দণ্ড-কাল আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল তাঁর—অবশিষ্ট কাল রাধাকুণ্ডে স্নান, লক্ষ নাম গ্রহণ, বৈষ্ণব প্রণাম ও যুগল মূর্ত্তির আরাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। ১৪৯৬ শকে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব হয়।

তাই বলছিলুম—ভোগবাদে সুখ নেই। ভোগবাদ—মনুষ্য নামধারী শ্রেষ্ঠ জীবের পক্ষে অনুপযুক্ত। পিতার বিরাট অর্থসম্পদ এবং যৌবনবতী পত্নীর রূপলাবণ্য তুচ্ছ করে এমন কি পেলেন রঘুনাথ?

পরম পাওয়ার সেই চরমানন্দের কাছে পৃথিবীর সকল পাওয়াই যে তুচ্ছ! প্রেমধন—বিশ্বে ছিল অনর্পিত। শুধু ছিল অভিধানে মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের প্রতি অসীম করুণায় সকলকে ধনী করতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

প্রেম-ভক্তি মহামূল্যরত্ন —
অভিধেয়-নাম, 'ভক্তি', 'প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥

—চৈঃ চঃ

ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

তবে তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তেহোঁ কহে—'মোরে, প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে—'তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

আমি সেই কৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবানের অভিন্ন স্বরূপ ছয় গোস্বামীর চরণ বন্দনা করি। শ্রীগৌররূপ-লীলাপরিকরাদি মনন পর গোস্বামীগণের কৃপায় অত্যন্ত অপবিত্র ব্যক্তিও পবিত্র হয়ে থাকেন। তাঁদের স্পর্শেই অন্তর্বর্তী ব্রহ্মাণ্ড সমূহও পরিশোধিত হয়ে থাকে। স্পর্শ না পাই—কৃপা পেয়ে যেন ধন্য হই। তাঁরা যেন পরম করুণায় আমাকে তাঁদের কৃপাধারণের উপযুক্ত করে তোলেন। আমি বহু জন্ম-জন্মান্তর তাঁদের কৃপাভিলাষী হয়ে অপেক্ষা করব।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

"নদীয়া আকাশে সংকীর্ত্তন মেঘ সাজে।
খোল করতাল মুখে গভীর গরজে ॥
হুহুঙ্কার বজ্রধ্বনি হয় মুহুর্মুহু।
বরিখয়ে নাম-নীর ঘন তুই পহু ॥
নাচে গায় পারিষদ থমকে থমকে।
ভাবের বিজুলী তায় সঘনে চমকে ॥
প্রেমের বাদলে নৈদা শান্তিপুর ভাসে।
রায় অন্তরের হিয়া না ডুবিল রসে ॥"

যখন সমগ্র নবদ্বীপকে এবং তন্নিকট অঞ্চলকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তনের মহানন্দে মাতিয়ে তুলেছিলেন —তখনই বাধা এলো।

নবদ্বীপে গৌড়ের বাদশার দৌহিত্র চাঁদ খাঁ কাজী বাস করতেন। গোড়াই নামক তাঁর এক কর্ম্মচারী ছিল—হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অকথ্য অত্যাচারের জন্য তিনি অখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

নবদ্বীপের শাক্তগণও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। মুসলমান ও হিন্দু শাক্তগণের প্ররোচনাতেই রাজ-প্রতিনিধি গোড়াই কাজী সক্রিয় হ'লেন। হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভু নাম প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র নবদ্বীপ এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলকে মাতিয়ে তুলেছিলেন।

মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্ত হরিদাস দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে নাম প্রচার করছিলেন।

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।
হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে বিলাইয়া ॥

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ করি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
রজত পর্ব্বত যেন ধূলায় লুটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল॥"

গোড়াই কাজীর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাসের নাম প্রচার প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'লো। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে কোন ভাবেই মহাপ্রভু কোন দিন আপস করেন নি, গোড়াই কাজীর অবৈধ হুকুম জারীর আভাস পেয়ে মহাপ্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করলেন। মহাসঙ্কীর্ত্তনের প্রারম্ভিক আয়োজনও সমাপ্ত হ'লো। শ্রীমদ্বৈত প্রভুর অধীনে একদল, শ্রীবাস ও হরিদাসের অধীনে একদল, স্বয়ং পরমপাবন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে গদাধর সহ আর একদল কীর্ত্তনকারী ভক্ত।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

অসংখ্য কীর্ত্তনকারী ভক্ত সমাবেশে এবং কীর্ত্তনে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠল। স্বয়ং মহাপ্রভু কীর্ত্তন করতে করতে ভাবতন্ময় হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। জীবের প্রতি পরম করুণায় তাঁর কমল নয়ন থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। 'উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।'

কীর্ত্তন করতে করতে তাঁরা চাঁদ কাজীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হ'লেন। অসংখ্য কীর্ত্তনকারী ভক্ত সমাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দেখে চাঁদ কাজী হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কি যে করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। অনুপম রূপ আর জীবের প্রতি অফুরন্ত অনুগ্রহ দেখে —চাঁদ কাজীর পক্ষে হতবুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

চাঁদ কাজী শেষ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুকে বিনম্রচিত্তে জিজ্ঞেস করলেন:

উচ্চৈঃস্বরে এভাবে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্য কি ? হরিনাম তো ঘরে বসেও চুপে-চাপে করা যায় ?

মহাপ্রভু তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনামের মাধুর্য্য ব্যাখ্যা করে বললেন : ঘরে বসে একান্তে হরিনাম করলে,—শুধু যিনি কীর্ত্তন করেন তিনিই পবিত্র হন্, কিন্তু অধম, পতিত, পশুপাখী কীট পতঙ্গের কি হবে ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুক্তির কাছে কাজীকে শেষ পর্য্যন্ত নতি স্বীকার করতে হ'লো। হরিনাম প্রচারের বাধাও দূর হ'লো।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাঝে মাঝে ভক্তগণের আবাসে উপস্থিত হয়ে কীর্ত্তন করতেন। মাঝে মাঝে তিনি শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তন করতেন। সেদিনও শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তন করছিলেন, শ্রীবাস নিজেও কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্তর্য্যামী কেমন করে যেন টের পেলেন শ্রীবাসের বাড়ীতে একটা কিছু অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়ই। অথচ শ্রীবাস কিছুই বলছে না। কীর্ত্তনের আনন্দ বিনষ্ট হ'বে বলেই শ্রীবাস কি কথা যেন গোপন করে রেখেছে।

পরে অনুসন্ধান করে মহাপ্রভু জানতে পারলেন—কিছুক্ষণ আগেই শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। এবং মৃতপুত্রের শবদেহ শ্রীবাসের বাড়ীর অভ্যন্তরে তখনও রয়েছে।

অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাস সে কথা মহাপ্রভুকে প্রকাশ করেন নি। 'জন্মিলে মরিতে হবে'। মৃত্যু এক অবধারিত সত্য। কিন্তু তজ্জন্য মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণের কীর্ত্তনের মহানন্দে ব্যাঘাত সম্পাদন করতে শ্রীবাস চান্‌নি।

জীবের প্রতি পরম করুণায়—মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেবেন বলেই স্থির করলেন। সমগ্র ভারতময় প্রেমবার্ত্তা (পূর্ব্বে যা ছিল অনর্পিত) ছড়িয়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন। সন্ন্যাসী পরিব্রাজক হয়ে তীর্থ পরিদর্শন ও নাম প্রচারই তাঁর লক্ষ্য। যিনি সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মদ্বারা চির

নির্লিপ্ত, তিনি তো চির সন্ন্যাসী—তাঁর পক্ষে আর সন্ন্যাস গ্রহণ করার কি প্রয়োজন ছিল। ধর্ম্ম কলহে বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক দার্শনিক তর্কজালে বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধিতে দুর্ব্বল—সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি কৃপাবশতঃই তাঁর প্রেম-ধর্ম্মকে সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে দিতেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন।

'আপনি আচরি প্রভু, জীবেরে শিখায়।'

একমাত্র পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন জেনে শচীদেবী যারপরনাই দুঃখিত হ'লেন। বজ্রের আঘাতের মতোই বাজল সে ব্যথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :—

"কে তুমি, তোমার পুত্র কেবা কার বাপ।
মিছা 'তোর মোর' করি' কর অনুতাপ॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে হৈলে কত হয় লাভ॥
আমার নিস্তার হয় তোমার পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজ—ছাড় পুত্র জ্ঞান॥"
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর—মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায়॥
চতুর্দ্দশ লোকনাথ মায়া কৈল দূর।
সর্ব্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।
'আপন তনয়' বলি' মায়া দূর কৈল॥

—চৈতন্যমঙ্গল।

বিখ্যাত পদকর্ত্তা নিমাই সন্ন্যাস প্রসঙ্গে বললেন :

শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর
উঠিল রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস
ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া মন্দির তেজিয়া
আইলা সুরধনী তীরে।

দুই কর জুড়ি নমস্কার করি
পরশ করিলা নীরে ॥
গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চননগর পথে।
করিলা গমন শুনি সব জন
বজর পড়িল মাথে ॥
পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন
সেই শুনি গলি যায়।
পশুপাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে
এ দাস লোচন গায় ॥

*   *   *

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
শিরে মারে করাঘাত ॥
এ মোর প্রভুর সোনার নূপুর
গলায় সোনার হার।
এ সব দেখিয়া মরিব ঝুরিয়া
জিতে না পারিব আর ॥
মুঞি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া ॥
কাঞ্চননগর গেলা বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন দগদগি মন
শচী না পাইল দেখিবারে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করে ভাগীরথী অতিক্রম করে কাঞ্চননগরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। এদিকে মণিহারা ফণীর মতো নিত্যানন্দপ্রভু,

মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও দামোদর প্রভৃতি পরিকরগণ—প্রভুকে অন্বেষণ করতে করতে কাঞ্চন নগরে উপস্থিত হ'লেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প থেকে বিরত হ'তে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু যাঁর ইচ্ছায় সকলেই সকল কর্ম্ম করে থাকেন, যাঁর ইচ্ছাতেই সব, তাঁকে কি বিরত করা সম্ভব ?

মধু শীল নামক একব্যক্তি মহাপ্রভুর আদেশে তাঁর চাঁচর কেশ মুণ্ডন করলেন। ভক্ত ও পরিকরগণের নয়নাশ্রু তাঁর রাতুল চরণকে অভিষিক্ত করল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা দিন। স্নান সমাপনান্তে কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে তাঁরই মনোনীত মন্ত্র প্রদান করলেন। এবং মহা-প্রভুকে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' আখ্যা দিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাদের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ, তাই তিনি — কৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে ম্লেচ্ছদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন :

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি—পুরুষার্থ সার॥

নবদ্বীপের পথে পথে যে প্রভু রসের ছন্দে ছন্দে নেচে বেড়াতেন— সেই প্রভু সারা ভারতের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন সন্ন্যাসীর বেশে। নিরুপম তাঁর সেই বিগ্রহ আর জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল জীবের প্রতি অফুরন্ত অনুগ্রহ।

যুগযুগ ধরে ভারতের পুণ্যাত্মাগণ নিখিল বিশ্বের আত্মার আত্মাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন—সেই তিনিই মানুষের খোঁজে সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরতে লাগলেন পথে পথে।

জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে পরমার্থের সন্ধান দিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের দিলেন রসরাজ উপাসনার নির্দ্দেশ। রসরাজ উপাসনা তো সকলের জন্য নয়—এর জন্য অনেক প্রস্তুতি, অনেক সাধনা, অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা, এবং আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন। আকস্মিক ভাবে রসরাজ উপাসনার রাজ্যে প্রবেশ সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। ধর্ম্মকে তিনি ব্যর্থ আচার অনুষ্ঠান থেকে রক্ষা করলেন, ভারতীয় দর্শনকে শুষ্ক তর্কজাল থেকে মুক্ত করে প্রেম মাধুর্য্য দ্বারা মণ্ডিত করলেন।

"সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম-নাম-প্রেম কৈল প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ

সপ্তম অধ্যায়

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

—চৈঃ চঃ আ ৯পঃ

এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্মলাভ করে আমরা ধন্য। কারণ এই ভারতবর্ষেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাধুর্য্যমণ্ডিত লীলা প্রকট করেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনও অনুপম রূপ ও জীবের প্রতি অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে তাঁর লীলা এই দেশেই প্রকট করেছেন।

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সংনস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥

—ভাঃ ৫।১৯।২২

দ্বিপরার্দ্ধ কাল আয়ুষ্মান্ হয়ে ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হয়ে ভারতভূমিতে জন্মলাভ শ্রেয়ঃ, কারণ সেই ব্রহ্মলোক থেকেও পুনরাবর্ত্তন সম্ভব। মর্ত্ত্যবাসীগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ু অল্প হ'লেও—সেই অল্পকাল মধ্যেই তাঁরা (যদি) তাঁদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণ করে হরির অভয়পদ প্রাপ্ত হ'তে পারেন, সে স্থান থেকে তাঁদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী তাই নিজ দৈন্য প্রকাশ করে জীবশিক্ষার তরে বলেছেন—

আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪পঃ

এই ভারতের ধূলিকণাও পবিত্র। সন্ন্যাসীর বেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলতে গেলে প্রায় সমগ্র ভারত ভূমিই পরিভ্রমণ করেছেন।

জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তিনি পরম করুণাবশে সকলকেই পরমার্থের সন্ধান দিয়েছেন।

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪আঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে—সেখানে জাতি কুলাদির বিচার নাই। ISKCON সংস্থাও বর্ত্তমানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত পথে কৃষ্ণ-চেতনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

ISKCON সংস্থার মূল বক্তব্য 'কৃষ্ণৈক শরণ'। অভক্তগণের পক্ষে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তারা তত্তৎসাধন ফলসমূহ লাভ করলেও—ভক্তগণের কাছে ভগবানই সর্ব্বস্ব। তিনিই একমাত্র আশ্রয় বা পরমাশ্রয়। অতএব 'কৃষ্ণৈকশরণ' হওয়া কর্ত্তব্য।

বিশ্বের পতিত, অবহেলিত, ভেদবুদ্ধি দ্বারা মানুষকে পরম করুণায় উদ্ধার করবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

'পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ১ অঃ

আমি ISKCON-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামীর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই—প্রেমবান ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডকে তারণ করবারও শক্তি ধরেন—

'ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে॥'

কিন্তু প্রকৃত ভক্তের সান্নিধ্য লাভ বা কৃপালাভ করা সহজসাধ্য বিষয় নয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে ব্রজেন্দ্রনন্দন তাই বলেছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

শ্রীভগবানের যশঃ শ্রবণে শ্রদ্ধা সকলের চিত্তে জাগেনা, এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা সহজে জাগে না—অবিদ্যাজনিত নানা সংশয় আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে রাখে। শ্রদ্ধা সকলের ভাগ্যে তাই সহজলভ্য নয়—ভগবানেরই অহৈতুকী কৃপার ফলে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয়।

সাধু সঙ্গে বা সাধুদের কৃপায় যে শ্রদ্ধা চিত্তে সঞ্জাত হয় ভগবানের লীলা এবং শাস্ত্রাদি শ্রবণে ও কীর্ত্তনে সে শ্রদ্ধা পরিপুষ্ট হয়। শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হ'লেই সকল সংশয়ের অপনোদন ঘটে, এবং সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তির পরই শ্রীভগবানে ভক্তিনিষ্ঠা জাগে। ভক্তি এক অচিন্ত্য শক্তি। ভক্তিনিষ্ঠা থেকেই হরিকথা শ্রবণে রুচি জন্মে। রুচি থেকেই কৃষ্ণাসক্তি। আসক্তি থেকেই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে। রতি গাঢ় হ'লেই তা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে রূপান্তরিত হয়। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণ-প্রেমেই পরমানন্দ।

কৃষ্ণপ্রেম ধনে ধনী ভক্তগণ স্বর্গ ও মুক্তিকে নরকের সমান মনে করেন।

'স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।'

—চৈঃ চঃ ম ১৯।২১৪

সাধু-সঙ্গই কৃষ্ণভক্তির মূল—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গ তরে ; কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥

—চৈঃ চরিতামৃত মঃ ২২ পঃ

সাধু বা বৈষ্ণবগণ ভাবদেহেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন। ভাবদেহ অজর, অমর, অব্যয়। ভগবানের প্রিয়জনের কৃপালাভে আমাদের হৃদয়গ্রন্থিতে আবদ্ধ জড় ও ভাবদেহের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়।

জড়দেহ এবং ভাবদেহ পৃথক। জড়দেহ প্রবর্দ্ধনের জন্য যেমন চালডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, ভাবদেহের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তেমন শ্রীভগবানের লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দন ও শাস্ত্রাদি অনুশীলনের প্রয়োজন। ভাবদেহধারী বৈষ্ণবগণের দেহ অপ্রাকৃত—কারণ জড়দেহ লয় প্রাপ্ত হ'লেও ভাবদেহের ক্ষয় নাই। ভাবদেহের মাধ্যমেই রাগানুরাগী ভজনকারী বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

উপরোক্ত উক্তির তাৎপর্য্যও সেখানেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এ সম্পর্কে বলেছেন—

"প্রভু কহে,—বৈষ্ণব দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়'॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
'অপ্রাকৃত' দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নবম অধ্যায়ে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত।

নিজগুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।
'ভক্তি' 'জ্ঞান' দুই জিজ্ঞাসিলা একদিনে॥
প্রভু বলে, "জ্ঞান 'ভক্তি' দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহত দেখি দৃঢ়॥"
কতক্ষণে ভারতী বিচার করি' মনে।
কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে॥
ভারতী বলেন—'মনে বিচারি তত্ত্ব।
সবা হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব॥'
প্রভু বলে—"জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে জ্ঞাসি গণে॥'

ভারতী বলেন—"তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন পথে যে গমন সবাকার॥
বেদশাস্ত্রে মহাজন পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি' অবুঝে সে অন্য পথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস।
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রুর উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব॥
ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর চরণে।
'জ্ঞান' বড় হৈলে 'ভক্তি' মাগে কি কারণে?
বিনা বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
'মুক্তি ছাড়ি' ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥
সবার বচনে এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান॥
কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই তোমা যেন সেবিয়ে সর্ব্বথা॥
এই মত যত মহাজন সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায়॥
অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ॥"
'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
হরি বলি' গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে॥
প্রভু বলে—"আমি কতদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে॥
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্র-ভিতরে॥'
প্রভু বলে—"যার মুখে নাহি ভক্তি কথা।
তপ শিখা সূত্র ত্যাগ তার সব বৃথা॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু-ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তিনি সনাতন শিক্ষায়ও ঐ ভক্তিরই প্রশংসা করেছেন। ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।

অতএব ভক্তি'—কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥

—চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ

তথাকথিত বেদবাদী মুনিগণ বেদের তাৎপর্য্য অবগত নয়, কারণ তাঁরা বেদের গূঢ়তত্ত্ব ভক্তিযোগ পরিহার করে জ্ঞানযোগাদির প্রাধান্য স্থাপন করেছেন।

বেদবক্তা স্বয়ং ভগবান তাই বেদ-প্রবক্তা হয়ে বলেছেন—

ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্।
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তুতে।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া।
মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্তরাম্ ॥

ভাঃ ৪।২০।৩২

বিশ্বদ্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণু আদিরাজ পৃথুর স্তুতি শ্রবণ করে বললেন—'রাজন্, আমার প্রতি তোমার ভক্তিবৃত্তি উদিত হোক। পূর্ব্ব-সুকৃত ফলেই এরূপ সুবুদ্ধি লাভ করেছে; পণ্ডিতগণ এই বুদ্ধিযোগ-দ্বারা (অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা) আমার দুস্তর মায়াকেও অতিক্রম করেছেন।'

ভক্তিগণ তাঁকে লাভ করে কৃতকৃতার্থ হয়। অভক্ত বা অসুরগণ নিজ দোষেই ভক্তিরূপ অমৃত লাভে অসমর্থ হয়। এর জন্য সমদর্শী ভগবান দায়ী নন্। জীবের চিত্তবৃত্তিই দায়ী।

শ্রীভগবানের ভক্ততোষণ ও অভক্তবঞ্চন কার্য্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সমুদ্রমন্থনদ্ভূত অমৃত-বিতরণ লীলা প্রসঙ্গে বলেছেন—

অসদাবিষয়মঙ্ঘ্রিং ভাবগম্যং প্রপন্নান্
অমৃতমমরবর্য্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যম্।

কপটযুবতিবেশো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং,

সুমহমুপস্থতানাং কামপূরং নতোঽস্মি ॥ —ভাঃ ৮।১২।৪৭

যিনি ছলপূর্ব্বক যুবতীবেশে দানবদের মোহিত করে সমুদ্রমথণোৎপন্ন অমৃত,—অসাধুগণের অপ্রাপ্য, উপাসনা লভ্য, স্বীয়চরণে শরণাগত অমরগণকে পান করিয়েছিলেন, সেই ভক্তগণের প্রার্থনা পূরণকারী ভগবানকে প্রণাম করি।

সমুদ্রমথণোৎপন্ন অমৃত বিতরণ লীলায় যেমন অসুরগণ নিজদোষে এবং ভক্তিরহিত হওয়ায় বঞ্চিত হয়েছেন, তদ্রূপ শ্রীভগবানের ভক্তিরসামৃত বিতরণের ক্ষেত্রেও অভক্ত যোগী প্রভৃতিগণ স্ব স্ব চিত্তবৃত্তির দোষেই বঞ্চিত হয়েছেন। তারা অ-রসজ্ঞবিধায় ভক্তিরসামৃত প্রাপ্তির অধিকারী হ'তে পারেন নি। চৈতন্য চরিতামৃতের রূপকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেছেন—

এ-সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিকভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য—নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ—কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
অভক্ত—উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্ত হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ —চৈঃ : অঃ ৪ পঃ

শ্রীভগবানের সমুদ্রমথনোদ্ভূত অমৃত বিতরণলীলা অপেক্ষা ভক্তিরসামৃতবিতরণ-লীলা পরম চমৎকারময়ী এবং ঔদার্য্যময়ী। কারণ সমুদ্রমথনোদ্ভূত মোক্ষসুধা অপেক্ষা, ভক্তিসুধা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। মোক্ষসুধা লাভে (বা ব্রহ্ম রসাস্বাদে) জড় ভোগানন্দকে তুচ্ছ মনে হয়—কিন্তু লীলারসাস্বাদন বা ভক্তি রস-সুধার কাছে সেই মোক্ষানন্দ বা ব্রহ্মরসাস্বাদও অতি তুচ্ছ।

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম,
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিম্যপি নাথ মাভূৎ,
কিম্বন্তকাসি লুলিতাং পততাৎ বিমানাৎ॥ —ভাঃ ৪।৯।১০

ধ্রুব বললেন—হে নাথ! আপনার পাদপদ্মধ্যানে অথবা আপনার জনের সঙ্গে আপনার চরিত কথা শ্রবণে যে আনন্দ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেরূপ আনন্দ অনুভূত হয় না, শমনের অসি ও অর্থাৎ কালদ্বারা খণ্ডিত স্বর্গীয় বিমান থেকে দেবগণেরও পতন হয়ে থাকে—তাঁদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

চৈতন্য চরিতামৃতেও বলা হয়েছে—

"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥

—চৈঃ চঃ ম ১৭শ পঃ

ভক্তি এক অচিন্ত্য শক্তি—এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। ভক্তিতেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। পরম পুরুষ ভগবান একমাত্র ভক্তিরই বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

'ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

—চৈঃ চঃ ম ২০

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।'—৩।৩।৩৩ সূত্রের মাধ্বভাষকৃত মঠের শ্রুতিবচন।

'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গে পরিজায়তে'

—বৃহন্নারদীয়পুরাণ

সাধুসঙ্গেই ভক্তি সঞ্জাত হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' সাধুসঙ্গে কেবল ভক্তিই উদয় হয় না—ভক্তির সিদ্ধি প্রেমলাভও ঘটে থাকে। জীবশিক্ষার জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদ ও ভক্তগণকে বিনম্র চিত্তে বলেছেন :

"তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই" —চৈঃ ভাঃ মঃ ২ আঃ।

জীবশিক্ষার তরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাসীর বেশেই তিনি প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেছেন—এবং প্রেমভক্তির মাধুর্য্য ভারতময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনিই আবার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করে সংসারে প্রবেশ করে—বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সকলেই সন্ন্যাসী হোক মন্মহাপ্রভু তা চান নি—গৃহীগণও যাতে হরিনামে ও কৃষ্ণ-ভক্তির মাধ্যমে পরমার্থের সন্ধান পান—তেমনতর ব্যবস্থারই নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। মর্কট বৈরাগ্যও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। ধনকুবের গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী—যখন পিতার বিষয় সম্পত্তি এবং পরম রূপলাবণ্যযুক্তা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সামনে দাঁড়ালেনঃ তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাকে বললেনঃ রঘুনাথ, তুমি গৃহে ফিরে যাও, মর্কট বৈরাগ্য দেখিও না।

রঘুনাথ বহুতর কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যেমেই প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁর বৈরাগ্য মর্কট-বৈরাগ্য ছিল না। পুরীতে মন্দিরের সিংহদ্বারে আহার্য্য লাভার্থে তিনি হাত পেতে বসে থাকতেন প্রথমে—যে যা প্রসাদ তুলে তুলে দিত তাই গ্রহণ করতেন। পরবর্ত্তীকালে এই ধরণের হাত পেতে বসে থাকাটাও তাঁর কাছে উঞ্ছবৃত্তিরই সামিলই মনে হলো—তিনি পরবর্তীকালে ঠাকুরের ভোগ যেখানে রান্না হতো—সেই রান্নাঘর সংলগ্ন নর্দ্দমা থেকে ফেন-যুক্ত অন্ন গ্রহণ করে ধৌত করতেন—এবং সেই ধৌত-অন্ন ইষ্টদেবকে নিবেদন করে গ্রহণ করতেন।

তাই বৈরাগী হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাঁকে উত্তম হয়েও তৃণের চেয়েও সুনীচ হ'তে হবে—বৃক্ষের অপেক্ষাও সহিষ্ণু হ'তে হবে। যার বিষয়ানুরাগ নেই—তার কাছে গৃহই তপোবন স্বরূপ।

কবি চণ্ডীদাস তাই সার্থকভাবেই বলেছেন—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে,

অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারিল দেহ।

কৃষ্ণপ্রেমরূপ বিষ জ্বালায় দগ্ধ হওয়ার মধ্যেও চরমানন্দ। বিশ্বে চির অনর্পিত ছিল এই কৃষ্ণপ্রেম ধন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—এবং সেই অনর্পিত প্রেমধন উদারভাবে বিতরণ করেছিলেন।

আর সাধারণ জীবের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলেন নাম-প্রেমের মালা।

'নাম প্রেম মালা গাথি পরাইল সংসার॥'

নিজেও মহাপ্রভু সংখ্যা-নাম গ্রহণ করতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে বলেছেন—

"বসি" কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে॥

ভিক্ষার্থ-নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ থেকেও তাঁর নাম প্রচারের মহিমা জানা যায়।

"ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবাস্থানে।
ব্যক্ত করি' ইহা কহিয়াছেন আপনে॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
'চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥"
তথা ভিক্ষা আমার যে হয় লক্ষেশ্বর।'
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত অন্তর॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি' বলেন 'গোসাঞি।
লক্ষের কি দায় সহস্রেকো কারো নাই॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার;
এখনেই পুড়িয়া হউক ছারখার॥'
প্রভু বলে,—"জান 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।

তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর।"
শুনিয়া প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি' মহানন্দ হৈলা মনে মনে॥
"লক্ষ নাম লইব প্রভু, তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য,—এমত করাও তুমি শিক্ষা॥"

—চৈঃ ভাঃ

এতকাল মানুষ শুধু ভগবানের কাছে ভিক্ষা করেই এসেছে—ধন দাও, যশ দাও, সুন্দরী বণিতা দাও।' আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্র নন্দন মানুষের কাছে নাম-প্রেমের ভিক্ষা চাইলেন। এ লীলার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

'ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥
নাচ, গাও, ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭ পঃ

জীব উদ্ধারের জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভূ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। নইলে চির সন্ন্যাসী যিনি (সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মেও যিনি সদা নির্লিপ্ত থাকেন) তাঁর সন্ন্যাস লওয়ার প্রয়োজন কোথায়? এবং তিনিই বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে কৃষ্ণতত্ত্বকে উদ্ধার করে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শুষ্ক তর্ক থেকে তিনি দর্শনকে মুক্ত করেছিলেন। ব্যর্থ আচার অনুষ্ঠান থেকে সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করেছিলেন।

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥

—চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ ও ২৪ পঃ

* * *

চিৎকণ জীব, কিরণকসম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥

জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৮ পঃ

'মায়াধীশ মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

—চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতবাদকে খণ্ডন করে শাশ্বত সত্যকে প্রকট করেছেন। তৎকালের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ এবং অদ্বৈতবাদী শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য শেষ পর্য্যন্ত এই সনাতন পুরুষকে প্রণাম জানিয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। মহাপ্রসাদেও সার্ব্বভৌমের বিশ্বাস জন্মেছিল।

আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে কৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ'॥

—চৈঃ চঃ ম ৬ঃ

তথাকথিত পণ্ডিতগণ বেদের নিগূঢ় বিষয় ভক্তিযোগকে উপেক্ষা করে কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদেরই প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। মহাপ্রভু তথাকথিত বেদ ধর্ম্মকে উপেক্ষা করে—'কৃষ্ণৈক শরণ' নিতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণ-প্রেমরস॥

—চৈঃ চঃ আ ১৭

* * *

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম
আকিঞ্চন হঞা কৃষ্ণৈক শরণ॥'

*   *   *

বিধি-ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ-পাপাচারে তার কভু নহে মন॥'

—চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

ভক্তের প্রিয় যে জন—সে জন ভগবানেরও প্রিয়। ভক্তের ভক্তগণ বা দাসানুদাসগণ ভগবানেরও অত্যন্ত প্রিয়।

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনাম্।

—বরাহপুরাণ

ভগবৎ ভক্ত বা সেবকগণের সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে সংশয় যদি থাকেও—কিন্তু যাঁরা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁদের সিদ্ধি বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এতেক বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্ত সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥

বৈষ্ণব বা ভক্তগণের সেবা করলে পরম-প্রেমময় ভগবানের কৃপা তাঁদের মাধ্যমেই সাধারণের ওপর বর্ষিত হয়ে থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীবাসকে বলেছেন—

সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে মোহারে পায় দৃঢ়॥

তিনি রায় রামানন্দকেও বলেছেন—

প্রভু কহে—তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥
তোমাতে যে প্রীতি হৈল রাজার।
এইগুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার॥

—চৈঃ চঃ ম ১১ পঃ

সার্ব্বভৌম জামাতা অমোঘ ছিলেন মহানিন্দুক। তিনি নানা ভাবে মহাপ্রভুর নিন্দা করেছেন। সেই অমোঘকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥
সার্ব্বভৌম গৃহে দাস-দাসী, যে কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥

বৈষ্ণবাপরাধের ক্ষমা নেই। সকল বৈষ্ণবগণের প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধাবান হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবগণের দেহকে প্রাকৃত বিবেচনায় অশ্রদ্ধাও করা উচিত নয়। সেই পরমপুরুষ ও সনাতন পুরুষ সাধারণ মানুষের অনেক দূরে—তাই তদীয় ভক্তগণের সেবা করেই তাঁর কৃপালাভ সহজ। তাই সকল বৈষ্ণবের চরণে প্রণতি জানিয়ে কেবল একটি প্রার্থনা জানাই 'আমি যেন জন্মে জন্মে ভক্তগণের দাসানুদাস হয়েই জন্মাতে পারি। আমি যেন তাঁদের সেবা করার অধিকার বা সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত না হই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বপার্ষদ সনাতনের দেহে কণ্ডুরসা প্রত্যক্ষ করে—ঐ দেহকে আলিঙ্গন করে বলেছেন—

"প্রভু কহে—বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ-ভজয় ॥"
"সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিলা পাঠাঞা ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদ-দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। যেমন অনুপম রূপ তাঁর, তেমন অফুরন্ত অনুগ্রহ।

প্রেম-ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের মাধুর্য্যরস অনুভব সম্ভব হয়। শ্রীভগবান প্রেমের 'বিষয়', ভক্তগণ প্রেমের 'আশ্রয়'।

পরম বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, পরমাশ্রয় শ্রীরাধা। 'আস্বাদনের চমৎকারিতাই মহারস ও রস সম্ভোগের চরম পরিণতিই নদীয়া বিনোদিয়া শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হওয়াতেই রসব্রহ্মের সানুভূতি প্রকটিত হয়েছে ভুবনে। রসিক ভক্ত চূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গৌরাঙ্গ আবির্ভাব সম্বন্ধে বলেছেন: 'আমিও আমার ভক্তের ন্যায় ভক্তি দ্বারা পূর্ণ আমার মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হ'বো।' শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধুর্য্য রস আস্বাদনের জন্যেই গৌররূপে অবতীর্ণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও অনুরূপ আভাস দিয়েছেন—

"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পনাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

* * *

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ

রাধাভাব-কান্তি নিয়েই শ্যামনাগর গৌররূপে এসেছেন। সঙ্গে করে এনেছেন—নিরূপম রূপ আর অফুরন্ত অনুগ্রহ। বেদনাহত

জীবের কণ্ঠে তিনি তাই পরম করুণায় নাম প্রেমের মালা পরিয়ে দিয়েছেন।

যুগ যুগ ধরে মানুষ ভগবানের জন্যে কেঁদেছে, সেই স্বয়ং ভগবান গৌররূপে এসে মানুষের জন্য কাঁদলেন।

'উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।'

শুধু কেঁদেই ক্ষান্ত হলেন না, মানুষকে তাঁর চিরন্তন দীনতা থেকে মুক্ত করলেন। মানুষ এতকাল শুধু ভগবানের কাছে চাইত— ধন দাও, যশ দাও, সুন্দরী বনিতা দাও ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই চরম দীনতা থেকে শ্রীমন্মহাপ্রভু মানুষকে মুক্ত করে বললেন —চাওয়া নয়। ভালবেসেই চরম আনন্দ। ভালবেসে পূর্ণানন্দ লাভ কর। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেমেই চরমানন্দ।

বিশ্বে অনর্পিত ছিল প্রেমধন—অভিধানে ছিল শুধু 'প্রেম' শব্দ। —শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম করুনায় অবহেলিত, বঞ্চিত, চির অভাবগ্রস্ত মানুষকে সেই প্রেমধনে ধনী করলেন। এমন করুণাময়ের কথা যথাযথ ভাবে বলতে পারি—তেমন যোগ্যতা আমার কই?

তাঁর নিত্যলীলা আজও ঘটছে—

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

আমি সেই ভাগ্যবানদের চরণ বন্দনা করেই ধন্য হ'তে চাই : কৃত কৃতার্থ হ'তে চাই।

"প্রেমসিন্ধু গোরা রায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,
করুণা বাতাস চারিপাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাকাল ছাড়ে,
তাপ-তৃষ্ণা সবাকার নাশে॥"

—কৃষ্ণদাস।

অষ্টম অধ্যায়

নমো মহাবদাণ্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।

—শ্রীল রূপ গোস্বামী।

মানবিক মূল্যবোধ ও কৃষ্ণপ্রেমের আলোকে মানবের জীবনায়নই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর অবদান। আর্ত মানুষের কাছে এই কৃষ্ণপ্রেম রসামৃত অর্পণই তাঁর বদাণ্যতার অনুপম নিদর্শন।

চির অনর্পিত প্রেমধনে চির দৈন্যগ্রস্ত মানুষকে পরম করুণায়—ধনী করে দিলেন ; এমন অপার করুণা তুলনাহীন।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁর রচিত শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ইষ্টদেব বন্দনায় বলেছেন ঃ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণং কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্॥
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যা ছিল চির অনর্পিত অর্থাৎ কোনকালে কাউকে যা দেওয়া হয় নি, সেই উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রসে অভিষিক্ত স্বীয় প্রেম সম্পদ বিলিয়ে দেবার জন্য করুণা বশতঃই তিনি (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বর্ণপুঞ্জের মতো উজ্জ্বল তাঁর দেহকান্তি। সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে সর্ব্বদাই দীপ্তি পেতে থাকুন।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণার্জ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

—চৈঃ চঃ আঃ-৩

উপনিষদে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম তিনি এঁরই (শ্রীচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যিনি অন্তর্যামী আত্মা, তিনিও এঁরই আংশিক বিভূতি। এমন কি ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান যিনি—তিনিও এঁরই স্বরূপ। অতএব কৃষ্ণরূপ চৈতন্য থেকে পরমতত্ত্ব আর কিছু নেই।

দীপ্তিমান বৃন্দারণ্যে কল্পতরুর নীচে রত্নমন্দিরে যে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ আসীন—সেই মিলিত রূপই শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে প্রকট। রাসলীলা-ভিলাষী ব্রজেন্দ্রনন্দন যে পরম সুন্দর বংশীবটের তলে বেণু বাজিয়ে গোপীগণকে আকর্ষণ করতেন—সেই তিনিই নদীয়ায় গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হ্লা'দিনীশক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
—শ্রীস্বরূপ গোস্বামি কৃত কড়চা

রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণপ্রেমই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণের সত্তা কখনই পৃথক নয়, কিন্তু লীলাবিলাসের জন্যই তাঁরা ভিন্নরূপে আবির্ভাব হয়েছিলেন। তাঁরাই আবার শ্রীচৈতন্যের মধ্যে দুই থেকে এক হয়েছেন শ্রীচৈতন্যরূপে। রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণ প্রেম নিয়ে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই চৈতন্যকে নমস্কার করি।

রাধা ভাব সুবলিত শ্যাম নাগর গৌররূপে স্বীয় প্রেম-ভক্তি যোগকে উচ্চে তুলে ধরলেন। বললেন—ভক্তি এক অচিন্ত্যশক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত আটটি শ্লোকের মাধ্যমে আমরা ভজন সম্বন্ধীয় বিশেষ নির্দ্দেশ পেয়ে থাকি। ঐ আটটি শ্লোক অমৃতময় শ্রীমদ্ভাগবতের নির্য্যাস এবং শিক্ষাষ্টক নামে খ্যাত। প্রথম শ্লোকে—নামাভাস ও শুদ্ধ নামের ফল, দ্বিতীয় শ্লোকে—শ্রীনাম কীর্ত্তনে অনুরাগের অভাব দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক; তৃতীয় শ্লোকে—শ্রীনাম কীর্ত্তনের প্রণালী; চতুর্থ শ্লোকে—কাম্য কি? ধন-জন প্রতিষ্ঠাদি নয়, ভগবানে অহৈতুকী

ভক্তি। কারণ—ভক্তি এক অচিন্ত্যশক্তি; পঞ্চম শ্লোকে—শ্রীকৃষ্ণ চরণে কৃপা প্রার্থনা; ষষ্ঠ শ্লোকে—কৃষ্ণপ্রেমের বাহ্যলক্ষণ। সপ্তম শ্লোকে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অন্তর্লক্ষণ এবং অষ্টম শ্লোকের মাধ্যমে—শ্রীমন্মহাপ্রভু একান্ত কৃষ্ণ-পরতন্ত্রতা শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পরমার্থের সন্ধান দিয়েছেন, অনুরাগী ভক্তগণের জন্য রসরাজ উপাসনার প্রবর্ত্তন করেছেন। রসরাজ উপাসনা সহজ নয়—চিরসুন্দরের সান্নিধ্য লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। চিরসুন্দরকে বরণ করার জন্য নিজেকে যোগ্য করে নিতে হবে। তবেই তো চিরসুন্দর এসে ধরা দেবেন; নিজেকে তাঁর যোগ্য করে তুলতে না পারলে চিরসুন্দর চিরকাল ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থাকবেন।

—শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহা দাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জয়লাভ করেছে। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে মনরূপ দর্পণ মার্জিত হয়, সংসাররূপ দাবানল নির্ব্বাপিত হয়, কল্যাণের জোৎস্না নেমে আসে, বিদ্যারূপ বধূ জীবন লাভ করে (অবিদ্যা অপনোদিত হয়); আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার আসে, প্রতিপদেই রস-সুধার আস্বাদ জন্মায় এবং সমগ্র অস্তিত্বকে আনন্দ-শীতল করে দেয়।

(Glory, eternal glory to Sri Krishna Sankirtan ; it wipes and polishes dust laden mirror of the soul, extinguishes the ragging forst conflagration of worldy life ; it endows the lily of righteous living with benevolent moonlight and yields life giving support to the bride of True knowledge ; it swells the ocean of Divine Bliss ; it adds the "full-relish' of nectar

to every syllable of the Holy Name, it leaves and chastens the entire self with the supreme spirit glory rests with such a Holy Name.)

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

—চৈঃ চঃ

কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত আর কোন গতি নেই। নামাভাস থেকেও কলিযুগের মানুষের মুক্তি সম্ভব। অনাদিকালের ভগবদ্‌বিস্মৃতি—আমাদের সেই আনন্দময় পরমপুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমাদের রসনা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত—(যে বিদ্যা দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানা যায় না—সে বিদ্যা জাগতিক দিক থেকে মূল্যবান হ'লেও—মূলতঃ মূল্যহীন)। হরিনাম বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে বা শ্রবণ করতে আমাদের প্রথমে ভাল লাগে না, রুচিপ্রদ হয় না—আন কথা বলতে বা শুনতেই আমরা ভালবাসি। কিন্তু প্রথমে হরিনাম রুচিপ্রদ না হ'লেও—শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি সেই নাম অনুদিন উচ্চারণ করা যায়, শ্রবণ করা যায়—তবে ক্রমশঃ রুচি জন্মে। নিরপরাধ হয়ে অনুদিন নাম গ্রহণ করলে—নামে রুচি জন্মে। সকল সংশয়ের অপনোদন হয়। অবিদ্যা ও অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত মনরূপ দর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়; সংসাররূপ যে দাবানল যা আমাদের প্রতিনিয়ত কামনা বাসনার ইন্ধন পেয়ে দগ্ধ করছে—সেই দাবানল নির্ব্বাপিত হয়, হৃদয়ের অন্তঃস্তলে বিদ্যারূপ বধূ জন্মলাভ করে। আনন্দের প্লাবনে সব দৈন্য—সব মালিন্য ভেসে যায়, কৃষ্ণ প্রেম সঞ্জাত হয়। চির অনর্পিত এই প্রেমধনে ধনী হ'তে পারলে আর কিছু চাওয়ার থাকে না—মুক্তি তুচ্ছ হয়ে যায়; অতি তুচ্ছ হয়ে যায় স্বর্গামৃতও। রসসুধার আস্বাদন আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে আনন্দ-শীতল করে তোলে।

—শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহজনি নানুরাগঃ ॥ ২

ভগবানের অনেক নাম। প্রত্যেক নামের সঙ্গেই তাঁর শক্তি সন্নিহিত রয়েছে (কারণ নাম এবং নামী এক্ষেত্রে অভেদ বা একাত্মক)। সেই নাম স্মরণের আবার কোন ছকবাঁধা নিয়ম নেই। হে ভগবান! এমনই তোমার কৃপা! কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে তাতে (সেই নামের প্রতি) আমার অনুরাগ জন্মাল না।

(The Names are indeed legion, endowed as they are with potent powers. Thou hast mercifully ordained that never shall there be barriers of time or clime for chanting of Thy Names. But alas, I am so unfortunate that love of Thy Holy Name has dawned not yet on me.)

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥

—চৈঃ চঃ

শ্রীভগবানের নাম নেওয়ার কোন সময় নেই, যখন যেখানে ইচ্ছা এই নাম গ্রহণ করা যায়; এবং শ্রীভগবানের সকল নামের মধ্যেই তাঁর অচিন্ত্যশক্তি যুক্ত রয়েছে। শ্রীভগবানের নাম এবং নামীর কোন প্রভেদ নেই। যখন যেখানে ইচ্ছা এই নাম গ্রহণ করা যায়, তবু মায়াবদ্ধ জীবদের এমনই দুর্দ্দৈব যে—সেই নামের প্রতি সহসা অনুরাগ জন্মায় না। আন কথা বলতে বা শুনতে আমরা

যত ভালবাসি—হরিনাম বলতে বা শুনতে আমাদের মোটেই ভাল লাগে না। তাছাড়া জড়বাদ এবং ভোগবাদের আবর্ত্তে পড়ে আমরা অনবরতই ঘুরপাক খেয়ে চলেছি। কলিযুগের মানুষের প্রতি করুণা পরবশ হয়েই রাধাভাবে বিবশ শ্যামরায় নামাবতার রূপে কলিতে প্রকট হলেন। এতকাল শুধু মানুষ ভগবানের জন্যে কেঁদেছে—ভগবান এসে গৌররূপে মানুষের দুঃখে বিচলিত হয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে কাঁদলেন—অনুপম রূপ আর অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে। স্বনাম প্রচার লীলার মাধ্যমে নিজের নাম নিজেই প্রচার করলেন তিনি। পরম অনুগ্রহে ধন্য করলেন—দ্বিধাগ্রস্ত মোহাচ্ছন্ন বিশ্বজনকে। তাঁর এই আবির্ভাব—সর্ব্বকালের ইতিহাসে অঘটন রূপে বর্ণিত হ'লেও—বাস্তব সত্য এবং চরম সত্য।

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥

—চৈঃ চঃ

শুধু নামের মাধ্যমেই পরমার্থের সন্ধান দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হ'লেন —রাধাভাবে বিবশ শ্যামরায় নামের মাধ্যমেই কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ নির্দেশ করলেন। কিভাবে নাম গ্রহণ করলে কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়— স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের মাধ্যমে তিনি তা বর্ণনা করলেন। চিরদিনের দৈন্য ঘোচাবার জন্য—চির অনর্পিত প্রেমধনের সন্ধান দিলেন, পথ-নির্দেশ করলেন।

—শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩

তৃণের অপেক্ষাও আনত হয়ে, তরুর মতো সহিষ্ণু হয়ে, আপন মান-অভিমান বিসর্জন দিয়ে, অপরের প্রতি (তিনি অমানী হলেও) সম্মান প্রদর্শন করে—সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করবে।

(By humility lowier far than that of a blade of grass, by forbearence more enduring than that of the patient tree, seeking no honour for self, and by showing respect to others that is due—does one prove one self worthy to chant the Name of Hari at all times.)

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

সকলেই সকল সময় হরিনাম গ্রহণ করতে পারে। হরিনাম গ্রহণে দেশ কাল বা জাতিভেদের কোন ব্যবধান নাই। কিন্তু নাম গ্রহণ করতে করতে কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হ'তে হ'লে —নাম-গ্রহণকারী ভক্তকে নিজেকে তৃণাধম ভাবতে হবে। তিনি নিজে উত্তম হয়েও আপনাকে তৃণাধম ভাববেন। তরুর মতো সহিষ্ণু হ'তে হবে তাঁকে। তরু বা বৃক্ষকে যে ছেদন করে, বৃক্ষ সেই ছেদনকারীকেও আঘাত হানে না, বরং যতক্ষণ সম্ভব শাখা বাহু বিস্তার করে—সেই ছেদনকারীকেও ছায়া প্রদান করে। জলাভাবে শুষ্কপ্রায় হ'লেও—বৃক্ষ কারো কাছে জল প্রার্থনা করে না। হরিনাম গ্রহণকারী ভক্তকেও তদ্রূপ অযাচক হ'তে হবে, তিনি কারো কাছে কিছু চাইবেন না—বরং যথাসাধ্য অপরকে সাহায্য করবেন। বৃক্ষ নিজে রৌদ্র-তাপ বৃষ্টি সহ্য করে—অপরকে রক্ষা করে থাকে। হরিনামকারী বৈষ্ণবকেও তদ্রূপ সকল অসুবিধা সহ্য করে—অপরকে রক্ষা করতে হবে। উত্তম হয়েও

হরিনামকারী বৈষ্ণবগণকে নিরভিমান হতে হবে। এমনকি দীনতার অভিমানটুকুও থাকবে না তাঁর। সকল জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জেনে—তিনি সকলকে সম্মান করবেন। এমন হরিনাম গ্রহণকারী বৈষ্ণবই কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দলোকে প্রবেশ করতে সমর্থ হবেন। কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দের কাছে জাগতিক ভোগ-সুখতো অত্যন্ত তুচ্ছ, এমনকি ব্রহ্মানন্দও সেই আনন্দের তুলনায় অতি নগণ্য বস্তু।

মহাপ্রভু এই শ্লোকের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ—পরহিতব্রতকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। সকলকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতে না পারলে, পরমানন্দময় মাধবকে ভালবাসা যায় না। এই ভালবাসা তাই ক্লীবের নয়, কাপুরুষের জন্যেও নয়—মহা বলশালী আত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের কামগন্ধহীন ভালবাসা। অদৃশ্য, অব্যক্ত, স্বরাট, স্বাধীন এবং আত্মারাম পরমপুরুষ এইরূপ কামগন্ধহীন ভালবাসার বশ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশিত পথে হরিনাম গ্রহণ করতে করতেই অন্তরে এরূপ ভালবাসার উদয় হয়।

—শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪

আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী বণিতাও চাই না—চাই না কাব্য প্রতিভা। হে জগদীশ! যেন জন্মে জন্মে ঈশ্বরস্বরূপ তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

(I covet no wealth, nor retinue, nor even lovely poesy ; let me only hug Thee to my heart in every successive life ; be pleased to grant me. O Lord, such selfless Devotion and love.)

ধন জন নাহি মাঁগো কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি মোরে কৃষ্ণ দেহ কৃপা করি॥ —চৈঃ চঃ

যাঁরা শুদ্ধভক্ত তাঁরা পরমেশ্বরের কাছে ধন, জন, সুন্দরী পত্নী বা কাব্য প্রতিভা কামনা করেন না। এমন কি পরমেশ্বর তাঁকে 'মুক্তি' দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেন না তিনি শুধু অহৈতুক ভক্তি

কামনা করেন। ভক্তি এক অচিন্ত্য শক্তি। যোগ নয়, জ্ঞান নয়—ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন পরম পুরুষ শ্রীভগবান। কারণ তিনি অচ্যুত। ভক্ত হৃদয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা সংযুক্ত। সর্ব্বথা ভক্ত হৃদয়াৎ চ্যুতি রহিতঃ যঃ সঃ অচ্যুত। অবশ্য যারা ভক্তির ব্যাকরণ সম্বন্ধে অবহিত নন তারা সমাস বাক্য লিখতে গিয়ে লিখবেন—'অচ্যুতঃ যঃ সঃ অচ্যুত।'

পুরাণে, উপপুরাণে নানারকম ভজন পথের নির্দেশ রয়েছে—পূজা পদ্ধতিও নানান রকমের। জাগতিক মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের কাছে তাই জীব প্রার্থনা করে থাকে—'ধনং দেহি যশং দেহি'। এ ধরণের প্রার্থনা দীনতার পরিচায়ক। মহাপ্রভু তাই জীবকে চিরদীনতা থেকে মুক্ত করে বললেন—চাওয়ার মধ্যে কোন আনন্দ নেই, কারণ অভাববোধ থাকলে পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; ভালবেসেই আনন্দ। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন প্রেমই পূর্ণানন্দ প্রদানে সক্ষম। অহৈতুকী ভক্তিই ঘনায়িত হয়ে প্রেমে পরিণত হয়। আর সেই অহৈতুকী ভক্তিই সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

—শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোক—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥৫

হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ! বিষম এই সংসার সমুদ্র। আমি তোমার দাস—এই সমুদ্রে ডুবেছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার চরণ কমলের ধূলিকণা সদৃশ মনে কর।

(O son of Nanda, I, Thy servant have fallen into the vortex of the terrible wordly ocean ; May Thy mercy but make me a peak of dust on Thy Lotus feet.)

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন। —চৈঃ চঃ

জীব মূলতঃ কৃষ্ণদাস। কিন্তু জীবের আত্মানন্দ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হওয়ায়, জীব মায়াবদ্ধ হওয়ায় ভগবদ্‌বিস্মৃতি জনিত কারণে জীবমাত্রেই দীন। মায়াবদ্ধ জীব কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত। শ্রীভগবান রাগাদি দোষ রহিত—জীব রাগাদিদোষ যুক্ত। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ। মায়াধীশ ভগবান এই পঞ্চক্লেশের দ্বারা বিব্রত নন; কিন্তু পরম পুরুষের বিচ্ছিন্নাংশ জীব পঞ্চক্লেশের দ্বারা সর্ব্বদা বিব্রত।

"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

—চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্য সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিরাকরঃ॥

—শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তি দ্বারা অশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকর।

স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।
স্বাভির্ভূত—পরমানন্দ স্বাভির্ভূত—সু-দুঃখভু॥
স্বদৃগুত্থবিপর্য্যাসসভবভেদজভী শুচঃ।
যন্মায় যা জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিংনুম॥

—শ্রীধর।

মায়া যাঁর বশীভূত তিনিই ঈশ্বর, মায়া দ্বারা যিনি প্রপীড়িত তিনিই জীব। স্বয়ং ভগবানেই পরমানন্দ অবস্থিত—কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের নিজ মধ্যেই আত্যন্তিক দুঃখ ভূমিকা অবস্থিত। জীব মায়া দ্বারা মোহিত হয়ে নিজ মায়িক দর্শনজাত বিপরীত বুদ্ধি জনিত কারণে ঈশ্বর সম্পর্ক রহিত হয় (অর্থাৎ সে যে মূলতঃ 'কৃষ্ণদাস'—এই কথা বিস্মৃত হয়), এবং ভেদদর্শন জনিত কারণে ভয় ও শোক ভোগ করতে থাকে।

মহাপ্রভু তাই জীবকে অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিতে বলেছেন। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই স্মৃতিই জীবের মধ্যে জাগাতে চেয়েছেন।

'হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ! বিষম এই সংসার সমুদ্র। আমি তোমার দাস—মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ায় এই সমুদ্রে ডুবেছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার চরণ কমলের ধূলিকণা সদৃশ মনে কর।

মহাপ্রভু রচিত শ্লোক সমূহের ভাবাদর্শের সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিরচিত কবিতার অদ্ভুত মিল দেখতে পাই।

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে। আমার সকল অহঙ্কার ঘুচাও চোখের জলে।'

'কৃষ্ণৈকশরণ' ব্যতীত ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার অন্যবিধ আর কোন পথ নেই।

—শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোক—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

তোমার নামগ্রহণকালে কবে আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন নামবে? কবে আমার মুখ—বাক্য ভাবাবেগে গদ্‌গদ্ হয়ে উঠবে? কবে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হবে?

(When will tears over flow my eyes, when will my voice husky with love, choke all utterances on my lips, and all my limbs will vibrate with ecstasy, to hear the chant of Thy sacred name?)

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলপন॥ —চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু উপরোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেমী ভক্তের বাহ্য-লক্ষণ প্রকাশ করেছেন। তাঁর নাম শ্রবণকালে নয়ন দিয়ে অশ্রুর প্লাবন নামবে। মুখবাক্য গদগদ হয়ে উঠবে। সর্বশরীর আনন্দ-পুলকে রোমাঞ্চিত হবে।

রাধাভাবে বিবশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গে অনুরূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পেত। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে—তিনি উন্মাদ হয়ে উঠতেন। এমনকি বৃন্দাবন বিরহও তাঁর কাছে ছিল অসহনীয়। রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরুর ষষ্ঠ শ্লোকে লিখেনে ঃ—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ।
প্রলাপানুন্মাদাৎ সত তমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ।।
দধদ্ ভিত্তৌ শশ্ব দ্বদনবিধুঘর্ষেন রুধিরং।
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কাছে স্বীয় লক্ষ লক্ষ প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের বিরহে বিকল হৃদয় হয়ে তিনি সর্ব্বদা উন্মাদের মতো প্রলাপ করতেন। গৃহের ভিতে সর্ব্বদা মুখ ঘষে ঘষে ক্ষতসৃষ্টি করেছিলেন। এবং তাঁর মুখের সেই ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়ত। গৌরাঙ্গের সেই মূর্ত্তি মনে করে আমি ব্যাকুল হয়ে পড়ি।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামি চৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন ঃ

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ ॥

—চৈঃ চঃ

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরুর চতুর্থ শ্লোকে লিখেছেন ঃ

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতোস্যরু বিরহাৎ।
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বা দ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজ পদোঃ ॥
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলাবকলং গদ্গদবাচা।
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

কাশী মিশ্রের ঘরে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দেহের সন্ধিস্থানগুলি শিথিল হয়ে পড়েছিল—ফলে হাত-পা দীর্ঘাহিত

প্রতীত হয়েছিল। তিনি মাটিতে গড়াতে গড়াতে গদ্গদ বাক্যে, কাতর হ'য়ে—বিকল হ'য়ে রোদন করেছিলেন। তাঁর সেই রোদনের অবস্থা স্মরণ করে হৃদয় আমার পাগল হয়ে উঠেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত চৈতন্যদেব স্তবের ষষ্ঠ শ্লোকে লিখেছেন:

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপনালিকলনয়া,
মুহুর্বৃন্দারণ্য—স্মরণজনিত প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি—প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

সেই চৈতন্য কি আবার আমার নয়ন পথে উদয় হবেন? সমুদ্রের (পুরীর) তীরে সুন্দর উপবনগুলি দেখে যিনি বারবার বৃন্দাবনকে স্মরণ করে বিবশ হয়ে পড়েছিলেন। ভক্তিরসিক তাঁর রসনা বারবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

—শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোক—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে॥

কৃষ্ণবিরহে আমার নিমেষ হয়েছে যুগ, নয়ন হয়েছে বর্ষা এবং জগৎ হয়েছে শূন্য।

(One wink appears like ages, tears stream down from my eyes like showers in rainy season, and the entire world itself appears like a dreary void, to me, barefit of the sight of Govinda.)

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন॥

—চৈঃ চঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেমের অন্তর্লক্ষণের কথা প্রকাশ করেছেন।

কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধাও বিরহে কাতর হয়ে বিশাখাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন :—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ ।
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ॥
ক্ব রাসরতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি
র্নিধি র্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্ ॥

—ললিতমাধব ৩।২৫

কোথায় নন্দকুলের চন্দ্রমা ? কোথায় তিনি, যাঁর অলঙ্কার হয়েছে শিখিপুচ্ছ ? মুরলী যাঁর মেঘমন্দ্রের মতো গম্ভীর ধ্বনি করে। তিনি কোথায় ? সেই ইন্দ্রনীল কান্তি কই ? রাসলীলার নটেশ্বর কোথায় ? কোথায় সখি আমার জীবন রক্ষার ওষধি ? আমার রত্ন—আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু কোথায় ? হায় ! হায় ! হা ধিক ! বিধাতাকে ধিক্ !

'সখিহে ! কোথা কৃষ্ণ ? করাহ দর্শন ।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন।'

বিদগ্ধমাধব নাটক থেকে এই অবস্থার আর একটি বর্ণনা তুলে ধরছি—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ড-খণ্ড মচিরা—
তুৎকম্পমালম্বতে ।
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ
সাস্রং পরিক্রোশতি ॥
নো জানে জনয়ন্ন পূর্ব্বনটন—
ক্রীড়া চমৎকারিতাং।
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিনবিশৎ
কোঽপ্যয়ং নবীন গ্রহ ॥

কিশোরী রাধিকা সম্মুখে ময়ুরপুচ্ছ দেখতে পেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছেন। গুঞ্জাফল দেখলেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে রোদন করছেন। জানি না, কোন নবীন গ্রহ বালিকা রাধার মনের রঙ্গভূমিতে নৃত্যলীলার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা নিয়ে প্রবেশ করেছে।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণোযদি ময়ি তবাগঃ কথমদিং,
মুধা মা রোদীর্ম্মে কুরু পরমিমামুত্তর কৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজবল্লরিয়ং,
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥ —বিদগ্ধমাধব ২।৭০

শ্রীরাধা বলছেন ঃ

'হে সখি! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হয়, তবে তোমার আর দোষ কি? মিছে কেঁদো না। বরং আমি মরে যাওয়ার পর কি করবে তাই ভাবো। আমার মৃত্যুর পর তমাল তরুর শাখায় আমার বাহুলতা বেঁধে রেখো। যাতে বৃন্দাবনে আমার এ দেহ চিরকাল থাকে।

পীড়াভির্নব কালকুট কটুতা
গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো।
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমা হুঙ্কার রসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দন পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে।
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

—বিদগ্ধমাধব ২।৩০

কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে কি আব বলব? বিরহে—বিরহবিষের ব্যথা নব কালকূটের গর্ব্বকে খর্ব্ব করে; আর মিলনে—আনন্দের ধারা অমৃতের মাধুর্য্যকেও অতিক্রম করে। সুন্দরি! নন্দনন্দনের প্রেম যার অন্তরে জেগেছে—তার কুটিলমধুর ভঙ্গি সেই শুধু জানতে পারে।

—শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোক—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথতথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৮

আমাকে আলিঙ্গন করে পদতলেই পিষ্ট করুন, অথবা দর্শন না দিয়ে মর্ম্মাহতই করুন, কিংবা সেই লম্পট তাঁর যেমন খুশী তেমন ভাবেই বিহার করুন, তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ, আর কেউ নয়।

(Let Him hug me, He's beloved, or crush me if He so wills ; let Him kill me outright, or banish me from His sight ; or in whatever other-ways let Him gratify His passion, yet He shall remain the Darling of my heart.)

এই শ্লোকটি সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতের রূপকার কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন ঃ

'এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে করিয়ে তারে নাহি পাই পার ॥ '

এই শ্লোকের মাধ্যমে মহাপ্রভু মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণই একমাত্র দয়িত—তিনিই সব। তাঁর আনন্দেই ভজনকারীর আনন্দ। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্যামনাগর—তৎভাবে বিভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্যকেই বিবরণ দিলেন। এবং চৈতন্য চরিতামৃতের রূপকার সেই ভাবের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে, মহাপ্রভুর বক্তব্যকেই বিশেষ রূপে তুলে ধরলেন।

আমি কৃষ্ণ পদ দাসী, তিঁহো রস-সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন, জারেন (দগ্ধ করেন) আমার তনুমন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে। শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।

মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোর যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠসুখ)

* * *

কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখ করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥

* * *

এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ
আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর
মন দেহ ধরণ না যায় ॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥

এ ধরণের কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরাধার কৃপা তথা ব্রজগোপীগণের আনুগত্য ছাড়া সম্ভব নয়। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার কৃপা ছাড়া এরাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম কৃষ্ণ শ্রীরাধা তথা ব্রজ-গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমে চির ঋণী ও চির সুবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। ঘনায়িত শৃঙ্গার রসের দ্বারা পরম-মাধুর্য্যমণ্ডিত বৃন্দাবন। নানা ধামের মধ্যে তাই ব্রজধামই শ্রেষ্ঠধাম।

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ বীরুধস্তৎ
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাতিমৃষ্টাঃ।

নত্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ—
গোপ্যোঽন্তরেন ভুজয়োরপি যৎ স্পৃহা শ্রীঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৫।৮

এই পৃথিবী আজ ধন্য তোমার পাদস্পর্শে, ধন্য এই তৃণগুল্ম-গুলি—নখস্পর্শে ধন্য এই তরুলতাদি, তোমার সদয় দৃষ্টিতে নদী, গিরি, পশু ও পাখি ধন্য। ধন্য গোপীগণ, যাঁরা তোমার বাহুযুগলের মধ্যে বক্ষের স্পর্শ পেয়েছে—যে বক্ষের স্পর্শ পেতে লক্ষ্মীও কামনা করেন।

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি, কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি তনয়া কুঞ্জে গোপবধূটী—বিটং ব্রহ্ম ॥

—হরিভক্তি সুধোদয়ে ॥ ৯৯

কার কাছে বা একথা বলব, কেই বা আমার কথা বিশ্বাস করবে—যে যমুনার কুলে কুঞ্জমধ্যে তরুণী গোপবধূদের সঙ্গে বিহার করেন স্বয়ং পরম ব্রহ্ম।

সেই পরম ব্রহ্ম আত্মধ্যানে মগ্ন ছিলেন। নিজেকে ভোগ করবার জন্য ভালবাসার প্রয়োজন। একা একা ভালবাসা চলে না। ভাল-বাসার প্রয়োজনেই এক থেকে তিনি হ'লেন দুই। দুই থেকে আবার তিন। তিনি সৎ, যাঁকে পৃথক করলেন তিনি চিৎ। এই দুইয়ের সম্ভোগে আনন্দ। তিনিই সচ্চিদানন্দ, তিনিই বিষয়—যাঁকে পৃথক করলেন তিনি আশ্রয়। মিলনে ঘনায়িত হ'লো রস।

বিষয় কৃষ্ণ, আশ্রয় রাধা। আস্বাদনের চমৎকারিতা এবং রস-সম্ভোগের চরম পরিণতিই রূপলাভ করল—শ্রীগৌরাঙ্গে। রস ব্রহ্মের সাত্মভূতি প্রকটিত হ'লো শ্রীগৌরাঙ্গে। আশ্রয়ের আশ্রিত হয়ে ভূমা নেমে এলেন ভূমিতে।

তর্কাতীত অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই পুরুষোত্তমের এই লীলাবিলাস।

এই অবিশ্বাস ও অবক্ষয়ের যুগে—জানি আমার একথা অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। অচিন্ত্যপূর্ব্ব এই বার্ত্তা—ইতিহাসে এক অঘটন স্বরূপ। কিন্তু যা কিছু অঘটন—তাই মিথ্যা নয়; অঘটনের মধ্যেই মাঝে মাঝে চরম সত্যের বিকাশ হয়ে থাকে।

ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবানের দর্শন ও লীলা বিলাস—তা' কেবল তাঁর অতর্ক অচিন্ত্য কৃপা শক্তিরই মহৈশ্বর্য্য জ্ঞাপক। তিনি কৃপা করে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কে নিজ দর্শন সামর্থ্য প্রদান করেন, কেবলমাত্র সেই ভাগ্যবানই তাঁকে দেখতে পান।

শরীরী ভগবান ও তাঁর শরীর একই পদার্থ ; শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে দেহ-দেহী ভেদ বিদ্যমান নয়—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্" ॥

ভগবানের স্বেচ্ছাপ্রকাশিকা প্রকাশত্ব-শক্তি দ্বারা তিনি স্বয়ং লোকচক্ষুতে অভিব্যক্ত হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত ব্যাপার নন্।

শ্রীগৌরপার্ষদ ভক্তপ্রবর শ্রীবাস মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

'অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে ॥

—চৈতন্য ভাগবত ।।৯।।

শ্রীভগবানের বিগ্রহকে তাঁরই কৃপায় ভক্ত এবং অভক্ত সকলেই দর্শন করতে সমর্থ হ'লেও—সকলের দর্শন ও দর্শনফল এক নয়। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তজনকে স্বীয় কৃপাদৃষ্টি দানে স্বীয় মাধুর্য্যের অনুভব সহ পরমানন্দজনক স্বদর্শন করিয়ে থাকেন, আর অভক্তজন মাধুর্য্যানুভব রহিত ভগবদ্দর্শন করে দুঃখলাভ করে। এ ব্যাপারে সমদর্শী ভগবান বৈষম্য দোষযুক্ত নন্', জীবের চিত্তবৃত্তিই দর্শন ও অনুভবজনিত তারতম্যের জন্য দায়ী।

নবম অধ্যায়

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যর্থ জ্ঞানালোচনা থেকে আমাদের দর্শনশাস্ত্রকে মুক্ত করেছেন।

বেদশাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী। বেদ অপৌরুষেয়। 'ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্'।

"বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ।"—বেদশাস্ত্র দ্বারা ধর্ম্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মকে জ্ঞাত করা হয়েছে।

"জ্ঞানং পরম গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমহিতম্।
সহরস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥"

ব্রহ্মাকে স্বয়ং ভগবান উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন :—'বিজ্ঞা ন সমন্বিত, রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরম গুহ্য জ্ঞান তোমাকে কৃপা করে ব্যক্ত করছি, তুমি তা গ্রহণ কর।'

ভগবৎ স্বরূপের প্রমাণ তাই এক্ষেত্রে—শব্দপ্রমাণ। শব্দপ্রমাণের অনুগত যে প্রমাণ, তাও প্রমাণ বলে গৃহীত হয়ে থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন :

"বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।"

শ্রীকৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বেদশাস্ত্রের বক্তব্য উল্লেখ করে শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন :

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য—সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয়ের নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ—শিরোমণি প্রেম মহাধন॥

—চৈঃ চঃ

বেদ চারটি—ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ। প্রত্যেক

বেদের আবার দু'টি করে অংশ। এক অংশের নাম 'মন্ত্র', আর অপর অংশের নাম 'ব্রাহ্মণ'। বেদবিহিত যজ্ঞাদিতেই মন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। আর ব্রাহ্মণাংশে সেই মন্ত্রাদির অর্থ ব্যক্ত।

সামগ্রিকভাবে বেদের তিনটি অংশ বা কাণ্ড—(১) কর্ম্মকাণ্ড, (২) দেবতাকাণ্ড ও (৩) ব্রহ্মকাণ্ড।

কর্ম্মকাণ্ডে রয়েছে—যজ্ঞাদি কর্ম্মের কথা; দেবতাকাণ্ডে—নানান দেবদেবীর উপাসনার কথা; এবং জ্ঞানকাণ্ডে রয়েছে—ব্রহ্মবিদ্যার কথা।

কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্ম আবার দু'প্রকার—(১) সকাম ও (২) নিষ্কাম।

সকাম কর্ম্মের লক্ষ্য—ঐহিক সুখ এবং পরকালে স্বর্গাদির সুখ। কিন্তু এর ফলে জীবের সংসার নিবৃত্তি সম্ভব নয়।

নিষ্কাম কর্ম্মে—ভোগ বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের চরম ও পরম উপদেশ।

দেবতাকাণ্ডে বর্ণিত সকল দেবদেবীকে আবার দু'ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে—(১) সগুণ ও (২) নির্গুণ। এক্ষেত্রে গুণ শব্দের অর্থ—'মায়িক গুণ'। সগুণ দেব-দেবীর উপাসনার মাধ্যমে দেহেন্দ্রিয়ের ভোগসুখ সাধিত হয়। মায়িক গুণময় বস্তুই কেবল লাভ হয়। নির্গুণ দেব-দেবীর উপাসনার মাধ্যমে গুণাতীত তত্ত্বলাভ হয়ে থাকে।

বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের জ্ঞানও দু' প্রকার—(১) পরোক্ষ জ্ঞান এবং (২) অপরোক্ষ জ্ঞান।

পরোক্ষ জ্ঞান বলতে—শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান; আর অপরোক্ষ জ্ঞান বলতে—পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার জনিত জ্ঞান বোঝায়।

অপরোক্ষ জ্ঞান-লাভ বা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়, সমস্ত সংসারের কর্মবন্ধনের অবসান হয়।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ —ভাঃ ২।২।২১

যে হৃদয়গ্রন্থি আমার জড়দেহকে ভাবদেহের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভে সেই গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয় ; মায়াবদ্ধ জীবের মায়া বন্ধন ছিন্ন হয় ; সকল সংশয়ের অবসান ঘটে ; কর্ম্মাকর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপনিষৎ—বেদের সার উপনিষদে। ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থ হচ্ছে—উপনিষদ। উপনিষদকে 'শ্রুতি' আখ্যাও দেওয়া হয়। সমগ্র বেদের পর্য্যাবসানই ব্রহ্মবিদ্যায় বা উপনিষদে। উপনিষদের মধ্যেই অভীষ্ট চরম ও পরম বক্তব্য নিহিত রয়েছে। উপনিষদই বেদের শেষ বা অন্ত। এই জন্য উপনিষদকে 'বেদান্ত'ও আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। যে শাস্ত্রের সহায়তায় সাধক মুক্ত হয়ে ভগবৎসমীপে উপস্থিত হন্ বা শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হন,—তাই উপনিষদ।

বেদাঙ্গ ঃ বেদের আবার ছ'টি অঙ্গ রয়েছে—(১) শিক্ষা, (২) কল্প (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দ এবং (৬) জ্যোতিষ।

শিক্ষা—বিষ্ণু সূক্তাদির উচ্চারণাদির বিষয় এতে ব্যক্ত হয়েছে।

কল্প—যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে—কোন কাজ আগে, কোন কাজ পরে করতে হবে—ইত্যাদি নানা বিষয় এতে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

ব্যাকরণ—শব্দের, পদের এবং বাক্যের সাধুত্ব বা নির্ভুলাদির বিষয় এতে সন্নিবেশিত।

নিরুক্ত—বেদোক্ত শব্দের বা পদের সঠিক অর্থ নির্ণায়ক শাস্ত্র।

ছন্দ—পদ্যবন্ধ, ছাদক, শ্রুতি মন্ত্রাদি ছন্দোবদ্ধভাবে কিরূপে পাঠ করতে হবে—সে বিষয়ে এতে নির্দেশ রয়েছে।

জ্যোতিষ—শ্রীভগবানের পর্ব্বমহোৎসবাদি, সময় নির্দ্ধারণ' চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণাদি এবং তিথি নির্ণয় প্রক্রিয়াদি এতে বর্ণিত হয়েছে। বেদাঙ্গ সমূহ উপাসনাদির আনুকুল্য বিধান করে থাকে।

প্রস্থানত্রয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দার্শনিক মতবাদ প্রস্থানত্রয় ও শ্রীমদ্ভাগবতের ওপর নির্ভরশীল। তত্ত্বনির্ণায়ক যে শাস্ত্র—তাকেই

প্রস্থান বলা হয়। প্রস্থান তিনটি—(১) শ্রুতিপ্রস্থান (২) স্মৃতি-প্রস্থান ও (৩) ন্যায়প্রস্থান।

শ্রুতিপ্রস্থান—বেদ-উপনিষদাদিকে শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়। গুরু-মুখেই শিষ্যগণ বেদাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতেন বলে—বেদ-উপনিষদাদিকে শ্রুতি আখ্যা দেওয়া হয়।

স্মৃতি-প্রস্থান—পুরাণ-ও ইতিহাসাদিকে স্মৃতি বলা হয়। বেদার্থ পরিপূরক পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি বেদার্থ স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জন্য পুরাণ ও ইতিহাস ইত্যাদিকে স্মৃতিশাস্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। 'মহাভারত' ইতিহাসের অঙ্গীভূত বিধায়, শ্রীমদ্ভাগবদগীতাও স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ন্যায়-প্রস্থান—ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। ব্রহ্মসূত্রাদি সঠিক বিচারের দ্বারা শ্রুতি বাক্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে—সেই জন্যই ব্রহ্মসূত্রাদিকে ন্যায়প্রস্থান আখ্যা দেওয়া হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে বেদান্তের ভাষ্য হচ্ছে—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীব্যাসদেবই বেদান্ত সূত্র রচনা করেছেন, তিনি আবার বেদান্তের ভাষ্য লিখলেন—'শ্রীমদ্ভাগবত।'

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যও উপরোক্ত প্রস্থানত্রয় ব্যতীত—শ্রীমদ্ভাগবতকে চতুর্থ প্রস্থান হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর মতে—শ্রুতি বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে কোন সংশয় উদয় হ'লে—শ্রীমদ্ভাগবতগীতার সহায়তায় তা' নিরসন করা যায়; এবং ন্যায় প্রস্থানের দ্বারা গীতা বাক্য সম্বন্ধীয় সব কিছু নিরসন করা যায়; কিন্তু ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধীয় সংশয় কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের সহায়তায় নিরসন করা সম্ভব। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে 'সমাধিভাষা' আখ্যা দিয়েছেন। শ্রীব্যাসদেব তাঁর সমাধি-লব্ধ তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু যাঁরা কেবলমাত্র তিনটি প্রস্থানকেই স্বীকার করেন—তাঁদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ হিসাবে স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে।

বেদান্ত ভাষ্যকারগণ তাঁদের স্ব-স্ব মতকে এই তিনটি প্রস্থানত্রয়ের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কারণ বেদানুগত্যই ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মুল বা প্রধান বিষয়বস্তু।

বেদান্ত সূত্রের প্রথম মন্ত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অথ—অর্থাৎ অনন্তর, তত্বজ্ঞ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের পর। অতঃ অর্থাৎ এই কারণে—যেহেতু কাম্যকর্ম্মের ফল পরিমিত ও নশ্বর। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা—ব্রহ্মকে জানবার জন্য ইচ্ছা করবে বা সচেষ্ট হবে।

"ত্বমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি '

ব্রহ্মকে জানতে পারলেই সংসার নিবৃত্তি হয়ে থাকে।

বেদের দ্বারাই বেদান্ত দর্শনের বিচার। যদিও উপনিষদ বেদের সার—কিন্তু উপনিষদের বিচারাদি প্রণালীবদ্ধ নয়। বেদ ও উপনিষদের বিভিন্ন বিচারের সমন্বয় সাধনের জন্য—শ্রীব্যাসদেব বেদান্ত দর্শন লিখলেন। এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। তিনি মুনি, ঋষি বা অতিমানব নন। তাঁর যুক্তির সঙ্গে ঋষি, দেবতা ও মহামানবগণের যুক্তির পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও তাঁর যুক্তিই গ্রহণীয়। কারণ তিনি শ্রীভগবানেরই অবতার।

গৌতমের 'ন্যায়', কপিলের 'সাংখ্য', পতঞ্জলির 'যোগ', কণাদের 'বৈশেষিক', জৈমিনির 'পূর্ব্বমীমাংসা' এবং 'উত্তর মীমাংসা' শ্রীশঙ্করের 'শারীরিক ভাষ্য'—এই ষড়দর্শন আলোচনা দ্বারা শুষ্ক তর্কের আবর্ত্তে পতিত হয়ে জীবের পক্ষে পরতত্ত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—

'তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥

—চৈঃ চঃ মঃ

মানব, মহামানব, ঋষি, মহাঋষি এবং দেবতাদের মনীষার ভ্রম, প্রমাদ, করুণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই চার প্রকার দোষ বিদ্যমান। অতএব উপরোক্ত ষড় দর্শনে ভুল, ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু

বেদান্ত দর্শনের রচয়িতা শ্রীবেদব্যাস শ্রীভগবানেরই 'শক্ত্যাবেশ অবতার'। অতএব উপরোক্ত চার প্রকার দোষ তাঁর বচনে নেই। অতএব শ্রীব্যাসদেব রচিত বেদান্ত দর্শনই গ্রহণীয়।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বললেন :

'নিত্য-অনিত্য-বিবেক যার হয়েছে, অনিত্য বস্তুতে যার বিতৃষ্ণা এবং শম-দম-তিতিক্ষাদি গুণ যার লাভ হয়েছে—তিনিই জিজ্ঞেস করবেন : 'ব্রহ্মবস্তু কি ?' ব্রহ্মবস্তু কি জানবার জন্য শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদাদিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যিনি বিজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্, অপরোক্ষ-অনুভূতি-সম্পন্ন।

কামক্রোধাদির দ্বারা অনাক্রান্তচিত্ত গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ পূর্বক জিজ্ঞেস করবেন—'ব্রহ্মবস্তু কি ?

শ্রীশঙ্কর বেদান্তের যে ভাষ্য লিখলেন—কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করলেন। শ্রীশঙ্করের ভাষ্যের নাম শারীরক ভাষ্য।

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"।

'ব্রহ্ম-সত্য, জগৎ-মিথ্যা, জীবই-ব্রহ্ম'। শ্রীশঙ্কর ঈশ্বর আর জীবে ভেদাভেদ রাখলেন না। মায়াধীশ ঈশ্বর ও মায়াবদ্ধ জীবকে এক করে ফেললেন। সূর্যের সঙ্গে সূর্যকিরণকে এক করে ফেললেন।

তিনি বললেন—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। জীবজগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র। মায়া-উপহিত ব্রহ্মই জীব। ভ্রম সংঘটনকারিণী অনির্বাচ্য মায়ার দ্বারা জগৎ ভ্রান্ত, জগৎ মিথ্যা মায়া-মরীচিকা মাত্র।

শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের নামান্তর-বিবর্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্ব্বাচ্যবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ প্রভৃতি।

শ্রীরামানুজ তদীয় 'শ্রীভাষ্যে' শ্রীশঙ্করের শারীরক ভাষ্যের বিচার খণ্ডন করলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যও শুদ্ধৈত-বাদ প্রতিষ্ঠা করে শ্রীশঙ্করের

মতবাদকে খণ্ডন করলেন। শ্রীনিম্বার্ক এবং বিষ্ণুস্বামীও শ্রীশঙ্করের মতবাদকে খণ্ডন করলেন।

কিন্তু তবুও শ্রীশঙ্করের মতবাদ ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান বিতর্কিত বিষয় হয়ে রইল।

"অনেক শক্তিমান সূক্ষ্মকারণোপাধি মায়াই ভগবদ্দেহ"--এই ধরণের বিভ্রান্তি ব্যাপক প্রসার লাভ করল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করের যুক্তিকে খণ্ডন করে বললেন :—বেদান্তের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতই গ্রহণীয়। কারণ শ্রীব্যাসদেব স্বয়ং বেদান্ত সূত্র রচনা করেছেন—এবং তিনিই ভাষ্য লিখেছেন; সেই ভাষ্যই হচ্ছে 'শ্রীমদ্ভাগবত", শ্রীমদ্ভাগবতেই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য, গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ এবং বেদাশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উল্লেখিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের দেহকে প্রাকৃত জ্ঞান করা অপরাধ।

এবং সেই সেই কারণেই শ্রীমন্মহাপ্রভু পৃথকভাবে বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করলেন না। 'শ্রীমদ্ভাগবতকেই' চতুর্থ প্রস্থান হিসাবে স্বীকৃতি জানালেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাশীতে অবস্থান করছিলেন—তখন আচার্য্য শঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বেদান্তসূত্রের অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মিকা ব্যাখ্যা শ্রবণ করে মায়াবাদের গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে বললেন ঃ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। শ্রীশঙ্করের ব্যাখ্যা কল্পিত ব্যাখ্যা ; কারণ তিনি স্বীয় মতকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শাস্ত্রের সহজ অর্থ গ্রহণ করেন নি।'

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় আমার তোমার নিন্দাতে॥ —চৈঃ চঃ

বেদান্তমতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ—সাকার। ব্রহ্ম অনন্ত গুণরাশির আধার বিগ্রহ, পরমেশ্বর, সর্ব কারণের কারণ।

শাস্ত্র মাত্রই শব্দাত্মক। বিশ্লেষণ রহিত বিশেষ্যকে শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরা অসম্ভব।

যদিও শ্রুতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়েছে—কিন্তু সেই 'নির্ব্বিশেষ' শব্দের প্রাকৃত অর্থ হচ্ছে 'প্রাকৃত-বিশেষত্ব-বৈচিত্র নিরাস।'

শ্রীমহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করে এবং শ্রীগুরুর কৃপাতে আমি এই-টুকুই বলতে পারি : যেহেতু শ্রীভগবান তর্কাতীত অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন—একমাত্র তাঁর মধ্যেই সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় সম্ভব। তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার, তিনিই বিশেষ, তিনিই নির্ব্বিশেষ—তিনিই সব। তিনিই একমাত্র গতি—তিনিই পরমাগতি।

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতদ্বাস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৬।৪৩

অতীতে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে—যত কিছু সচল বা স্থির, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বস্তু দৃষ্ট হয় বা শোনা যায়—সে সকলকে তত্ত্ব বিচারে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু বলে স্বীকার করা যায় না। তিনিই সমস্ত কিছুর পরমাত্মা।

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেহ ও দেহী অভেদ। শ্রীকৃষ্ণ দেহকে প্রাকৃত দেহরূপে জ্ঞান করা ভ্রমাত্মক।

'আমিই সকল প্রাণীতে প্রভুরূপে বিদ্যমান, আমিই পরমাত্মা—ওই তত্ত্ব না জেনে মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার মানব দেহ দর্শন করে আমাকে মানুষ রূপে জ্ঞান করে'। —শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ৯।১১

অতএব শ্রীশঙ্করের ভাষ্যকে স্বীকার করলে শ্রীমদ্ভাগবত গীতাকেও অস্বীকার করতে হয়।

'তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' জানি॥

—চৈঃ চঃ মঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভারতীয় দর্শনকে ব্যর্থ জ্ঞানালোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে—বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে কৃষ্ণতত্ত্বকেই' তুলে ধরলেন। বললেন—'শ্রীকৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়।'

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে জগৎ প্রতীতির কারণ—মায়া। এবং যদি মায়াকে একটি 'সত্তা' বলা যায়—তাহ'লে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় আর এক সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। মায়াকে দ্বিতীয় সত্তা বলে মেনে নিলে—ব্রহ্মের অদ্বয় জ্ঞানত্ব লোপ পায়। শ্রীশঙ্কর 'মায়া' সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন নি। মায়া যদি সৎও নয়, অসৎও নয়—মায়া তবে কি ?

শ্রীব্যাসদেবই বেদান্ত সূত্র রচনা করেন, বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যও তিনি রচনা করেন—সেই ভাষ্যামৃতই শ্রীমদ্ভাগবত।

বেদান্তসূত্রে—চিদ্‌বিলাস, সবিশেষ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ব্রহ্মের বর্ণনা রয়েছে। ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপ নেই বলে তাঁকে 'নিরাকার'! প্রাকৃত গুণ নেই বলে নির্গুণ এবং প্রাকৃত বিশেষ নেই বলেই ব্রহ্মকে 'নির্বিশেষ' বলা হয়েছে।

মূলতঃ ব্রহ্ম অপ্রাকৃত—সচ্চিদানন্দ—বিগ্রহবিশিষ্ট এবং অচিন্ত্য শক্তির অধিকারী। তর্কাতীত অচিন্ত্যশক্তির মাধ্যমেই তাঁর লীলাবিলাস। বেদান্ত দর্শনে শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকেই জগতের মূল কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম সূত্র 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র উত্তরে দ্বিতীয় সূত্র 'জন্মাদস্য যতঃ' উল্লেখ করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে প্রথমেই রয়েছে—'জন্মাদস্য যতঃ'

জন্মাদস্য যতোঽন্বয়াদিতরত—
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ো
মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিদামৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।১

স্পষ্টবস্তু মাত্রেই তিনি আছেন—তাই তাদের চেনা যায়—মিথ্যা বস্তুতে তিনি নেই—তাই তাদের চেনা যায় না। এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তিনিই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি অন্তর্য্যামিরূপে বেদকে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিষয় ভাবতে গিয়ে জ্ঞানীদেরও মোহ জন্মে। মরুভূমিতে দূরের বালিকে জল মনে হয়, অনেক সময় কাচকেও জল মনে হয়। এই যে মাটি, জল ইত্যাদির একটিকে অন্যটি বলে প্রতীত হয়—ঠিক তদ্রূপ তাঁর ত্রিবিধ সৃষ্টি—(১) চিৎ বা চৈতন্যের প্রকাশ, (২) জীবসৃষ্টি, (৩) মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি।

তাঁর এই ত্রিবিধ সৃষ্টিই সত্য অথচ তিনি স্বীয় তেজে মায়াকে দূরে রেখে মায়াতীত সত্যস্বরূপে বিদ্যমান। তাঁকে ধ্যান করি।

[যতঃ—যে পরমেশ্বর থেকে বিশ্বের জন্মাদি হয়েছে অর্থাৎ যিনি অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, স্বয়ং বিশ্বের কর্তা, পালক, অনুগ্রাহক, বিনাশক, এবং যিনি প্রলয়ের উপাদান কারণ, তা' থেকেই বিশ্বের জন্মাদি।

'অস্য—এই পরিদৃশ্যমান চতুর্দশ ভুবনাত্মক বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় হয়েছে ও হচ্ছে যাহা থেকে—তিনিই জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই পরমেশ্বর—

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্‌ঘ্রি পঙ্কজং,
বিরিঞ্চি-বৈরিঞ্চ্য—সুরেন্দ্র বন্দিতম্।

পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং,

ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পর প্রভুঃ ॥

—ভাঃ ১।১১।৫

দ্বারকাবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—হে নাথ! আপনার পদ পঙ্কজের বন্দনা করি। স্বয়ং ব্রহ্মা, সনকাদি কুমারগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনার চরণ বন্দনা করেন। এ সংসারে যারা শ্রেয়ঃ কামনা করে—ঐ পাদপদ্মই তাদের পরম অবলম্বন। 'কাল' ব্রহ্মাদির প্রভু হ'লেও আপনার পাদপদ্মের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম নয়।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর, দেবকীর উদরে জন্ম যাঁর পক্ষে একটি বাদ মাত্র (ভা ১০।৯০।৪৮)।

শ্রীকৃষ্ণই স্বরাট ও স্বাধীন।

স্বয়ন্তসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ

স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমস্তকামঃ।

বলিং হরিদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ,

কিরীট কোটীড়িত পাদপীঠাঃ ॥

—ভাঃ ৩।২।২১

ভক্তপ্রবর উদ্ধব বিদুরকে বললেন—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনিই ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই। তিনিই স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণ কাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল পূজোপহার সমর্পণ পূর্বক কোটী কোটী কিরীট সংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁর পাদপীঠের স্তব করেন।

মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই চতুর্থ প্রস্থান রূপে স্বীকৃতি জানিয়ে উপদেশ দিলেন ঃ

'অতএব ভাগবত করহ বিচার।

ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার ।।, —চৈঃ চঃ

শুধু তাই নয় শ্রীমদ্ভাগবতের মহত্ত্ব প্রকাশ করে বললেন—

'কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীভাগবত।

তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ।।"

কলি প্রাবল্যে কৃষ্ণতত্ত্ব বিস্মৃতির অন্ধকারে যখন প্রায় অবলুপ্ত, ভারতীয় দর্শন যখন ব্যর্থ জ্ঞানালোচনায় পর্য্যবসিত—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হয়ে বিস্মৃতপ্রায় আত্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন, দর্শনকে ব্যর্থ জ্ঞানালোচনা থেকে মুক্ত করে বললেন :—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন ।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ

"দশম অধ্যায়"

"বিপ্লব মানে শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়—বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন।"

মহাপ্রভুর আবির্ভাব শুধুমাত্র সনাতন ধর্ম্মের অধিদেবতা হিসাবেই নয় ;—জগতিক বিচারেও এক মহান বিপ্লবীর আবির্ভাবই বটে।

ধর্ম্ম কলহে বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক তর্কে বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত বাঙালী তথা ভারতবাসী তথা সমগ্র জগতকে সকল বর্ণ ও সকল্ জাতি নির্ব্বিশেষে এক সাম্য, সেবা, মানবিক বোধ ও প্রেমধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যই যেন তাঁর আবির্ভাব।

অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন অসহযোগের বাণী শ্রীমন্মহাপ্রভু বাঙ্গালী তথা মানব জাতিকে শিখিয়েছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সংঘর্ষময় যুগের পটভূমিকায় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

ভারতীয় দর্শন যখন শুধুমাত্র ব্যর্থ জ্ঞানালোচনায় পর্য্যবসিত—জ্ঞানবাদীরা যখন কেবলমাত্র ব্যর্থ আচার অনুষ্ঠান সর্ব্বস্ব, জাতির জীবন-আকাশে যখন ঘোর অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ লোকাচার আর আত্মঘাতী ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা যখন সমগ্র জাতি দুর্বল, মুসলমান নবাবদের শাসন যখন মাথার ওপর খড়্গের মত উদ্যত— তখনই এই সনাতন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আবির্ভাব।

অতিদর্পীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে যখন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে মরছিল, ধর্ম্মান্তর যখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল তখনই তিনি এলেন এক মহান বিপ্লবীর মতো।

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।"

আচারের নামে যখন কেবল অনাচার গ্রাস করছিল জাতিকে।

ব্রহ্মতত্ত্বে উদাসীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উগ্র গোঁড়ামি, গুণ কর্ম বিচারহীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অত্যাচার, বিধর্ম্মী শাসনের উৎপীড়ন ও অত্যাচার, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিকৃতি ও ব্যাভিচার, ধর্ম্মের নামে তথাকথিত তান্ত্রিক অনাচার ও ব্যাভিচার—সর্ব্বস্তরের মানুষকে যখন আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধি ও পঙ্কিলতার আবর্ত্তে প্রায় নিমজ্জিত করে ফেলেছিল, মানুষের দীনতা, হীনতা ও নিষ্ঠুরতা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, মানবিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে যখন মানুষ উদাসীন হয়ে পড়েছিল, ভোগবাদ, জড়বাদ আর ভেদবুদ্ধির আবর্ত্তে আত্মিক উন্নতির যখন সকল পথ রুদ্ধপ্রায়, কৃষ্ণতত্ত্ব যখন বিস্মৃতির অন্ধকারে প্রায় অবলুপ্ত —তখনই মহান্ বিপ্লবীর মতো এই সনাতন পুরুষের আবির্ভাব ঘটল।

কাজী যখন নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন প্রচার বন্ধ রাখার জন্য হুকুম জারী করলেন, এবং দণ্ডদানের ভয় দেখালেন—

"আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাত যে লইমু॥"

—চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু তখন মূর্ত্তিমান বিপ্লবের মতো কাজীর অন্যায় আদেশকে অগ্রাহ্য করে ভক্তগণকে মহাসংকীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হ'তে বললেন। বলা বাহুল্য, নবদ্বীপের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা 'চাঁদ কাজী' গৌড়েশ্বর নবাবের দৌহিত্র। অতএব তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে এভাবে রুখে দাঁড়ানো খুব সহজ ছিলনা। কীর্ত্তনীয়া ভক্তদের তো কোন অস্ত্র নেই, সম্বল কেবল খোল করতাল। তবু মহাপ্রভু তাঁদের কাজীর অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেছিলেন।—সেদিন তিনি মহাবিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

'কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন॥
তা সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিয়া লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগর মণ্ডন॥

সন্ধ্যাতে দেউটি (মশাল) সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে॥'

-- চৈঃ চঃ

অতএব মহাপ্রভুকে যদি মহাবিপ্লবী আখ্যা না দিই, তবে আর কাকে সে আখ্যা দিব ? মহাপ্রভুই কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—

'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ।।'

চণ্ডাল কে আর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বা কে ? হরিভক্তি বিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হরিভক্তি যুক্ত চণ্ডালই শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভুকে শুধু মুসলমান কাজীর বিরুদ্ধেই লড়তে হয়নি—তথাকথিত তৎকালীন হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষকদের বিরুদ্ধেও অকুতোভয়ে লড়াই করতে হয়েছিল। যে সকল তথাকথিত ধর্ম্মরক্ষকগণ হিন্দুধর্ম্মকে আচারসর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। মহাপ্রভু সে সকল তথাকথিত ধর্ম্মরক্ষকদের ওপর আঘাত হেনে—সঙ্কীর্ণতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করেছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কারের ওপর আঘাত হেনে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

'যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম চণ্ডাল॥
ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
করিবেক সম্মান বহুমান্য করি ।।"

- চৈঃ চঃ

স্বীয় সঙ্গী ছোট হরিদাসের বর্জ্জনের মধ্য দিয়ে রয়েছে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের দৃপ্ত কঠোরতার প্রকাশ; তাঁর সেই কঠোরতার আদর্শ আমাদের মনে মনুষ্যত্বের প্রেরণা যোগায়। যে প্রেমের ঠাকুর বেদনাহত জীবের বেদনায় বিচলিত হয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে মানুষের জন্য কেঁদেছেন, সেই তিনিই আবার লোকহিতের জন্য নির্ম্মম ও নিষ্করুণ হয়েছেন। অথচ ছোট হরিদাসের অপরাধ তেমন গুরুতর ছিল না। কিন্তু লোকহিতের জন্য মহাপ্রভু সেই সামান্য অপরাধকেও গুরুতর অপরাধ বলেই বিবেচনা করেছিলেন।

জাগতিক বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম—যুক্তিমূলক, নীতিমূলক, পরমার্থমুলক। শুধু মানুষে মানুষে নয়—সমগ্র বিশ্বের এক মহামিলনের বাণী। এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব বার্ত্তা। এক অভূতপূর্ব্ব, উপমাহীন আলোকবর্ত্তিকা। এবং রক্তপাতহীন এক মহান বিপ্লব সংঘটিত করলেন। তিনি আমাদের প্রচলিত ধারণার মধ্যে—কি আদর্শে, কি চরিত্রবত্তায়, কি আধ্যাত্মিকতায়। এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন নিয়ে এলেন। আমাদের সাহিত্যে, আমাদের মননে সেই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন প্রতিফলিত হ'লো।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :—"চৈতন্যযুগে সাহিত্যসৃষ্টি ও ধর্ম্মচর্চ্চার এই সর্ব্বব্যাপকতা আশ্চর্য্যভাবে উদাহৃত। যখন কোন মহাভাব-প্রেরণা জাতির চিত্তকে অধিকার করে, সর্ব্বত্রই ইহার দিব্য স্পর্শ সঞ্চারিত হয়। শুধু কাব্যময়, সৌন্দর্য্য-সাধনায় নয়, মননের প্রতিশাখায়, দর্শন, অলঙ্কার, ইতিহাসবোধ, জীবন সচেতনতায় ইহার প্রাণোচ্ছলতা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আদর্শ-নিষ্ঠায় ও বাস্তব জীবন-চর্চ্চায়, ধ্যানালোকের নভোবিহারে ও প্রাত্যহিক জগতের মৃত্তিকাচারিতায় যে অপূর্ব সমন্বয়ের সংযোগ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, ভবজীবন ও কর্ম্মজীবন যে প্রেরণা সাম্যে একই কেন্দ্র-বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে, তাহার তুলনা শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে সুদুর্ল্লভ।"

দিশেহারা জাতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যেই খুঁজে পেল এক নতুন আলো, এক নূতন শক্তি। হিন্দুসমাজকে অনিবার্য্য ভাঙন থেকেও রক্ষা করলেন তিনি। স্বার্থবুদ্ধি প্রসূত ধর্ম্মীয় কুসংস্কার ও কঠোরতাকে তিনি প্রেমভক্তির বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন। সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করলেন। হরিনামের মাধ্যমে তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে এক করলেন, ভোগবাদ ও জড়বাদের উর্দ্ধে মানুষকে উত্তীর্ণ করে প্রকৃত মর্য্যাদা দিলেন তিনিই, মানুষকে সকল দীনতা ও হীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে হরিনামের মাধ্যমে পরমার্থের সন্ধান দিলেন।

নামাবতার চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত নাম-কীর্ত্তনের মধুর ও আন্তরিক ব্যাখ্যা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও করেছেন। নয়নের সম্মুখে যে প্রাণপুরুষ ছিলেন না, বিশ্বকবির অন্তরে কি জানি কখন সেই প্রাণপুরুষ আপন ঠাঁই করে নিয়েছিলেন।

তাইতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমাদের বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা কাঠার মধ্যে বাস করিতেন না। তিনি তো সমস্ত মানবকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল। তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলি সৃষ্টি হয় নাই। সকলেই আপন আহ্নিক, তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়াছিল। তখন এমন কথা কি করিয়া বাহির হইল—

'মার খেয়েছি না হয় আরও খাব
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়

"বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক। মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক। তাঁর পক্ষে সেই একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

"আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলি লোক ক্ষেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কাণা ছুড়িয়া মারিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কাণা ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিতে দেখতে এমনই হাহাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেরও প্রভেদ রহিল না। তখন তো আর্য্য কুল-তিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলেন নাই। আমি তো বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে, তর্ক বিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপন আপন গর্ত্তের সুড় সুড় করিয়া প্রবেশ করে। কারণ মরার বাড়া

আর গাল নাই। বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা অসুবিধার কথা হইতেছে না, আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে।

"চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন, তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠ-বিহারী সুরগুলি কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোলে সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ-রাগিনী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল। একজনকে ছাড়িয়া সহস্রজনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্ত্তন বলিয়া একটি নূতন সম্পৎ উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বর, অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দন-ধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিনীর বৈঠকী কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দন ধ্বনি।"

[**রবীন্দ্র রচনাবলী : ১১শ খণ্ড : ৬৬৪ পৃঃ**]

"নাম প্রেমের মালা গাঁথি পরাইল সংসার।"

রবীন্দ্রনাথ যেন উপরোক্ত বক্তব্যকেই সার্থক ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করলেন। বিশ্বকবির লেখনীতেই মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত নাম-প্রেমের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা সম্ভব।

মহাপ্রভু যে চির অনর্পিত প্রেমধন বিতরণ করেছিলেন, সে প্রেমধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন, 'পরশমণি' কবিতার মধ্যমে তিনি সনাতন গোস্বামীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন :

'যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক।
মাগি আমি নতশিরে' এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মাণিক॥

[স্পর্শমণি : 'গীতাঞ্জলি' থেকে উদ্ধৃত]

রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের জয়গান।

একশ' তিপান্ন

নিখিল বিশ্বাত্মার আত্মা যিনি—তাঁর আনন্দস্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁর রচিত অনেক কবিতায় তিনি সেই আনন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্মের কথাই প্রকাশ করেছেন। সেই আনন্দস্বরূপের প্রতি আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় প্রচ্ছন্ন। তাই তাঁর রচিত কবিতার মধ্যে পাই অসীম আনন্দলোকের সন্ধান। সীমার মধ্যে অসীম ও অনন্তের বাঙ্ময় প্রকাশ। বাস্তব জীবনের সুখ, দুঃখ, অনাচার ও ব্যাভিচারকে তুলে ধরবার জন্য অনেক কবিই তো রয়েছেন—কিন্তু কেবলমাত্র ভোগবাদ বা জড়বাদের গণ্ডীর মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য সীমিত নয়। সুন্দরের কবি তাই সীমার মধ্যে অসীম অনন্ত সুন্দরকেই নামিয়ে এনেছেন—ভূমির মধ্যেই ভূমাকে অনুভব করেছেন। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই সোচ্চার।

'রসো বৈ সঃ
রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।
কো হ্যেবনাৎ কঃ প্রাণাৎ,
যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দয়তি॥' —তৈত্তিরীয় ২।৭

সেই পরমতত্ত্বই রস-স্বরূপ। সেই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েই জীব আনন্দ লাভ করে। কেই বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দ স্বরূপ না হ'তেন? তিনিই আনন্দস্বরূপ এবং তিনিই সকলকে আনন্দ প্রদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিই নন—তিনি সেই আনন্দস্বরূপের অন্যতম পূজারী।

'আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে। আমার সকল অহংকার ঘুচাও চোখের জলে।'—এই দুটি ছত্র কি মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত সেই প্রেম-ভক্তি ধর্ম্মকেই তুলে ধরছে না? রবীন্দ্রনাথের কবিতার যিনি যে ধরণের ব্যাখ্যাই করুন—তাঁর কবিতায় প্রেমভক্তির প্রকাশ বিদ্যমান।

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

অন্তঃ কৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্ ।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

—ভাগবতসন্দর্ভ (২)

যিনি অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে গৌর, যাঁর মহিমা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে সুপ্রকাশিত, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সংকীর্ত্তন যজ্ঞের মাধ্যমে ভজনা করি।

কৃপা সুধা-সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্য প্রভুং ভজে ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১৬ পঃ

শ্রীচৈতন্য প্রভুর দয়া যেন অমৃতের নদী। নদী সারা জগৎ ভাসিয়ে দিলেও সর্ব্বদা নিম্নাভিমুখেই প্রবাহিত হয়। মহাপ্রভুর করুণাধারাও তদ্রূপ সমগ্র জগতকে পরিপ্লাবিত করে—নীচ এবং অভাজনদের দিকেও প্রবাহিত হয়েছে। সেই চৈতন্য প্রভুকে ভজনা করি।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত—শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত—'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত থেকেই শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অমিয় জীবন কথা জানা যায়। বৈষ্ণবগণের কাছে উপরোক্ত দুইটি গ্রন্থ প্রামাণ্য ও অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ হিসাবেও স্বীকৃত।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত ; আদি খণ্ডে—শ্রীচৈতন্যপ্রভুর আবির্ভাব থেকে গয়া গমন লীলা, মধ্য খণ্ডে—গয়া থেকে প্রত্যাগমনের পর শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ, মহাপ্রকাশ লীলা, জগাই মাধাই উদ্ধার, কাজী উদ্ধার ও সন্ন্যাস গ্রহণ এবং অন্ত্য খণ্ডে—সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে গমন,

সার্ব্বভৌমোদ্ধার, গৌড় বিজয়, পুনরায় নীলাচল বিজয়, মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে কৃপা এবং ভক্তবৃন্দ সহ কীর্ত্তন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা।

আদি লীলায় রয়েছে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব, আবির্ভাব থেকে স্বরু করে ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যৌবনের লীলাবিলাস। মধ্য লীলায় রয়েছে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, পরিব্রাজকরূপে (ছয় বৎসর কাল) মহাপ্রভুর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ ও ধর্ম্ম প্রচার। আর অন্ত্যলীলা খণ্ডে রয়েছে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলা শেষ আঠারো বৎসরের লীলাবৈচিত্র্য। ১৮ বৎসরের মধ্যে ৬ বৎসর তিনি ভক্তগণ সহ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর, এবং শেষ ১২ বৎসর শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ নামক দু'জন অন্তরঙ্গ পরিকরের সঙ্গে বিপ্রলম্ভভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা রস আস্বাদন।

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-ব্যথায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥'

—চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মূলতঃ তৎকালীন 'চলিত' বাংলাভাষায় রচিত হ'লেও—এই পবিত্র গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভগবদ্‌গীতা, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি প্রমুখ বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ভাবরস সমৃদ্ধ।

যা ছিল চির অনর্পিত অর্থাৎ যা কোন কালেই কাউকে প্রদান করা হয়নি, সেই মধুর রসে অভিষিক্ত স্বীয় প্রেমসম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দেবার জন্যই তিনি করুণাবশে কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা
কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা
কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

একশ' ছাপ্পান্ন

সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ
কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী—
গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

—শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা থেকে

চন্দ্র যেমন সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রও তেমন শচীর গর্ভসিন্ধু থেকে আবির্ভূত হয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে। চৈতন্যরূপে প্রকট হয়েছিলেন। তিনটি সাধ পুরণের নিমিত্ত ঃ প্রথম সাধ—রাধাপ্রেমের মহিমা কতখানি তা তিনি জানবেন। দ্বিতীয় সাধ—সেই প্রেমের আলোকে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের চমৎকারিতা অনুভব করবেন। তৃতীয় সাধ—সেই চমৎকারিতা অনুভব করে রাধার আনন্দ কতখানি—তাও তিনি অবহিত হবেন।

বৈরাগ্য (শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুতে অনাসক্তি), বিদ্যা (ভগবৎ-তত্ত্বানুভূতি)—এবং কাল প্রভাবে বিনষ্ট স্বীয় ভক্তিযোগ শিক্ষা দেবার জন্যও তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব বিস্মৃতির অন্ধকারে যখন অবলুপ্তপ্রায়—ঠিক সেই সময়ে এই সনাতন পুরুষের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায়—নবদ্বীপের শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গন আলোকিত করে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণে, হরিকীর্ত্তন মুখরিত পূর্ণিমা লগ্নে—নিরুপম রূপ আর অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে প্রকট হয়েছিলেন তিনি। তাঁর রূপে পূর্ণিমার চাঁদের গর্ব্বকেও খর্ব্ব করেছিল। তাই বোধ হয় সেদিনের পূর্ণিমার চাঁদ রাহুর করাল ছায়ার অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছিল।

ক্রমে বড় হ'তে লাগলেন তিনি। যথারীতি নামকরণ উৎসব হ'লো তাঁর। নাম রাখা হ'লো বিশ্বম্ভর। মায়ের দেওয়া আদরের

নাম—নিমাই। স্বর্ণপুঞ্জের মতো উজ্জ্বল তাঁর দেহকান্তিতে অভিভূত হয়ে কেউ কেউ তাঁর নাম রাখলেন—গৌরাঙ্গ।

প্রভু যখন শিশু বয়সে হামাগুড়ি দিয়ে চলতেন—মাঝে মাঝেই কাঁদতেন, কিছুতেই কান্না থামানো যেতনা তাঁর, কিন্তু হরিনাম শুনলেই কান্না থেমে যেতো।

তারপর তিনি হাঁটতে স্বরু করলেন। একদিন মায়ের দেওয়া খই সন্দেশ না খেয়ে একদলা মাটি মুখে পুরলেন। শচীমা ছুটে এসে খুব বকলেন তাঁকে। শিশু প্রভু হাসতে হাসতে বললেন—মাগো, সব কিছুইতো মাটির বিকার মাত্র, তবে আর মাটি খেতে আপত্তি কি? ছেলের কথা শুনে মা' তো অবাক!

আর একদিন এক ব্রাহ্মণ অতিথি জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি এলেন। আপন ইষ্টদেবের জন্য তিনি ভোগ রেঁধে রেখেছিলেন—শিশু প্রভু সহসা সেই ভোগ খেতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ কি আর করেন, আবার নূতন করে ভোগ রাঁধলেন, কিন্তু সেই ভোগও তিনি তাঁর ইষ্টদেবকে নিবেদন করতে পারলেন না। শিশু নিমাই আবার সেই ভোগ খেতে লাগলেন। পরিশেষে সেই ব্রাহ্মণ জানতে পারলেন—শিশু নিমাই-ই তাঁর আরাধ্যদেব।

অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥

—চৈঃ চঃ

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের দুরন্তপণাও বেড়ে যেতে লাগল।

ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে॥
শিশু সব লয়ে পাড়াপড়শির ঘরে।
চুরি করে দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥ —চৈঃ চঃ

শচীমাতা ছেলের দুরন্তপণায় অস্থির হয়ে উঠলেন, তিরস্কার করলেন নিমাইকে। মায়ের তিরস্কারে সাময়িক ভাবে নিমাই শান্তরূপ ধারণ করলেন মাত্র।

গঙ্গার ঘাটেও তাঁর দুরন্তপণার ক্ষেত্র প্রসারিত হ'লো। গঙ্গার ঘাটে কুমারী মেয়েরা নৈবদ্য সাজিয়ে পূজা করে—নিমাই সেই নৈবেদ্যে ভাগ বসাতে লাগলেন। একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেয়ে নিমাই বললেন—আমায় পূজা কর, অভীষ্ট বর পাবে।

সকলের কাছ থেকে নানা অভিযোগ পেয়ে শচীদেবী একদিন নিমাইকে মারবার জন্য ছুটে গেলেন। নিমাই আত্মরক্ষার জন্য আস্তাকুঁড়ের হাঁড়ির ওপর গিয়ে বসলেন, এবং ওখানে বসেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথা শোনাতে লাগলেন। পরিশেষে মা শিশু নিমাইকে স্নান করিয়ে ঘরে আনলেন।

মাঝে মাঝে শিশু নিমাইয়ের খালি পা থেকেই নুপুর নিক্কণ শোনা যেতে লাগল। এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গনে দেবতাদের আনা-গোণাও হ'তে লাগল। তবু নিমাইয়ের পিতা মাতা বাৎসল্য রসের প্রভাবে শিশু নিমাইকে মানবশিশু জ্ঞানেই লালন-পালন করতে লাগলেন।

চলিতে নুপুরধ্বনি বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন॥
মিশ্র কহে—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নুপুরের ধ্বনি॥
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥ — চৈঃ চঃ

নিমাই যখন আর একটু বড় হ'লেন—তাঁকে হাতে খড়ি দিয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠান হ'ল! এদিকে তাঁর দাদা বিশ্বরূপের বিয়ের প্রস্তুতি চলতে লাগল। কিন্তু তিনি একদিন রাত্রে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে গেলেন। নিমাই পিতা-মাতাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু একদিন নৈবেদ্যের পান খেয়ে তিনি নিজেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্ছাভঙ্গ হওয়ার পর নিমাই বললেন যে, দাদা তাঁকেও সন্ন্যাসী হ'তে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ায় শচীমা অন্তরে ব্যথা পেলেন, নিমাইকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্রও নিত্যধামে চলে গেলেন। নিমাই পিতার পারলৌকিক কর্ম্মাদি সমাপন করলেন। পাছে নিমাইও সন্ন্যাসী হয়ে যায়, এই ভয়ে শচীদেবী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে দিলেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের ঘরণী হয়ে তাঁর ঘরে এলেন।

নিমাই তখন আর পড়ুয়া নয়—পণ্ডিত। বিভিন্নশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। নিজের বাড়িতে টোল খুলে তিনি ছাত্রদের পড়াতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহের কিছুকাল পরেই নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন। পূর্ব্ব বাংলার জনসাধারণ নিমাই পণ্ডিতের অনুপম রূপ আর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'লেন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন অনেকে। পূর্ব্ব বাংলাতেই তপন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো তাঁর। তপন মিশ্র স্বপ্নের মাধ্যমে জেনেছিলেন—শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং ভগবান। পরবর্ত্তীকালে তিনি মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে কাশীতে বসবাস করেন।

মহাপ্রভু যখন পূর্ব্ব বাংলায় অবস্থান করছিলেন—বিরহরূপ কাল সর্প তখন লক্ষ্মীদেবীকে দংশন করে। সর্পদংশনের কারণে লক্ষ্মীদেবী অপ্রকট ধামে গমন করেন। পূর্ববাংলা থেকে নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে—লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু সংবাদ পান্। নিমাইকে গৃহবন্ধনে বেঁধে রাখার জন্য শচীদেবী আবার সচেষ্ট হ'ন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের ঘরণী হয়ে আসেন।

একদিন নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে বসে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কাশ্মীর দেশীয় দিগ্বিজয়ী দাম্ভিক পণ্ডিত কেশব মিশ্র এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং একশত শ্লোকের মাধ্যমে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে গর্ব্বভরে মহাপ্রভুর দিকে তাকালেন

মহাপ্রভু সেই শ্লোকের ত্রুটির কথা বিনীত ভাবে উল্লেখ করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গগনচুম্বী গর্ব্বকে খর্ব্ব করে দিলেন।

শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত॥

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতিভা জড়ীভূত হয়ে পড়েছিল।

গয়াতে গিয়ে মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে ফিরে এলেন বটে তিনি, কিন্তু এ যেন আর এক নিমাই। দিব্য ভাবাবেশের মধ্যে মহাপ্রভু যেন নূতন রূপে প্রকট হলেন।

একদিন শ্রীবাসের বাড়ী গিয়ে বিষ্ণুর সিংহাসনে উঠে বসলেন। তাঁর অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই নব নব ভাবাবেশে প্রকাশ পেতে লাগল। কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দও এসে মিলিত হ'লেন তাঁর সঙ্গে। এলেন শান্তিপুরের অদ্বৈতপ্রভুও। শ্রীবাস অঙ্গনে যে হরিনাম যজ্ঞের সূত্রপাত হ'ল—অগণিত ভক্ত ও জনসাধারণের মধ্যে সেই হরিনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঘর থেকে পথে—নাম প্রেমের প্লাবনে সকলেই মেতে উঠল। জগাই মাধাই নামে দুই পাষণ্ড এই হরিনাম কীর্ত্তন সহ্য করতে না পেরে নিত্যানন্দ প্রভুর মাথা লক্ষ্য করে কলসীর কাণা ছুঁড়ে মারলেন—রক্ত ঝরে পড়ল। নিত্যানন্দ প্রভুর ওপর এধরণের আঘাতে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হ'লেন বটে, কিন্তু পরম দয়াল নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কাতর প্রার্থনায় তিনি ক্রোধ সংবরণ করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করলেন। জগাই মাধাইয়ের মনে পরিবর্ত্তন এল! জগাই মাধাইয়ের মত পাষণ্ডও মহাপ্রভুর কৃপালাভ করে ধন্য হ'লেন।

কিন্তু মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই নাম-কীর্ত্তন বন্ধ করার জন্য একদল লোক আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে মহাপ্রভু নিয়মিত কীর্ত্তন করতেন। একদিন চাপাল-গোপাল নামে একটি দুষ্ট লোক শ্রীবাস অঙ্গনের দরজায় মদ এবং অপবিত্র বস্তু রেখে এলেন। কীর্ত্তন বন্ধ হ'ল না তাতে, কিন্তু চাপাল-গোপালই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হ'ল।

"তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা সকরুণ॥" —চৈঃ চঃ

অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভু থেকে বয়সে অনেক বড়, হলেও মহাপ্রভুকে ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করতেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে গুরুর মতোই মান্য করতেন বলে অদ্বৈতপ্রভু দুঃখ পেতেন।

অদ্বৈতপ্রভু তাই ভাবলেন মহাপ্রভুর বিরুদ্ধ মত প্রচার করে তিনি প্রভুর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্য হবেন।

তাই অদ্বৈতপ্রভু ভক্তির চেয়ে জ্ঞানই বড় বলে সোচ্চার কণ্ঠে প্রচার করতে লাগলেন। অদ্বৈতপ্রভু এধরণের প্রচার করছেন শুনে —মহাপ্রভু একেবারে অদ্বৈতপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে অদ্বৈত আচার্য্যকে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রহার করলেন। অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর দ্বারা প্রহৃত হয়ে আনন্দসাগরে ভাসলেন। এতদিন পরে তাহ'লে প্রভুর কৃপা হ'ল।

'তবে আচার্য্য গোঁসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥' —চৈঃ চঃ

মুকুন্দ দত্তও মায়াবাদীদের সঙ্গে মিশে মায়াবাদীদের মতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ায় মহাপ্রভু বললেন: 'মুকুন্দ, তোমার ওপর আমি প্রসন্ন হ'লেও শীঘ্র হবো না।'

মহাপ্রভুর বাক্য শুনে মুকুন্দ দত্ত আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন এই ভেবে যে, একদিন তো প্রভুর করুণা হবেই।

নামাচার্য্য হরিদাসও নবদ্বীপে এসে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত কীর্তন যজ্ঞে যোগদান করলেন। হরিনাম কীর্ত্তনের প্লাবনে 'শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে ভেসে যাওয়ার' উপক্রম হ'লে চাঁদ কাজী হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার বন্ধ রাখার জন্য আদেশ জারী করলেন। মহাপ্রভু কাজীর সে আদেশ অগ্রাহ্য করে সহস্র সহস্র ভক্তগণ সঙ্গে নগরকীর্ত্তনে বেরুলেন। শেষ পর্য্যন্ত চাঁদ কাজীকেই নতি স্বীকার করতে হ'ল। মহাপ্রভু যেন মূর্ত্তিমান বিপ্লব। সেই বিপ্লবকে রোধ করার মতো ক্ষমতা কাজীর ছিল না।

'চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ —চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর বয়স যখন প্রায় চব্বিশ বছর। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে তিনি সহসা গৃহত্যাগ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ, শচীমাতার নয়নের মণি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা নেবেন বলে মহাপ্রভু কাঞ্চনগরে এসে ভারতী গোঁসাঞির সঙ্গে মিলিত হ'লেন। তাঁর চাঁচর কেশ যখন মুণ্ডিত হ'লো—তখন অনেকেই কেঁদে ফেললেন। তাঁর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হ'ল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' সন্ন্যাস গ্রহণের পরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। রাধা ভাবে বিবশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, কোথায় আমার সেই বৃন্দাবন? কোথায় আমার প্রাণবল্লভ? কোথায় আমার দয়িত সেই কৃষ্ণ।' রাধা ভাবে বিবশ শ্যামরায় বৃন্দাবনের পথের নিশানা যার সঙ্গে দেখা হয়—তাঁকেই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

নিত্যানন্দপ্রভু, আচার্য্যরত্ন আর মুকুন্দ মহাপ্রভুকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। রাঢ় দেশে এসে শুনলেন—এক নবীন সন্ন্যাসী বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছেন আকুল হ'য়ে। নিত্যানন্দপ্রভু ঐ অঞ্চলের রাখাল বালকদের মিনতি করে বললেন—যদি কোন নবীন সন্ন্যাসী বৃন্দাবনের পথের নিশানা জানতে চায়, তারা যেন সেই সন্ন্যাসীকে গঙ্গাতীরের রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

গুপ্তে তা সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সভাকারে করিয়া প্রবন্ধ॥
বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তাঁরে॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন॥
শিশু সব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল॥ —চৈঃ চঃ

অতএব ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু যখন ঐ অঞ্চলের রাখাল বালকগণের কাছে বৃন্দাবনের পথের নিশানা জানতে চাইলেন, তখন তাঁরা নিত্যানন্দপ্রভুর পরামর্শানুযায়ী মহাপ্রভুকে গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিল।

এদিকে নিত্যানন্দপ্রভু রাখাল বালকগণকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে আচার্য্যরত্নকে শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। যাতে শচী-মা ও নবদ্বীপের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে পারেন, সেরূপ ব্যবস্থাও করতে বললেন। আর মহাপ্রভুকে অপর পারে নিয়ে যাবার জন্য গঙ্গার তীরে একখানা নৌকা প্রস্তুত রাখা হ'ল। আচার্য্যরত্নের মাধ্যমে অদ্বৈতপ্রভুকে সেরূপ অনুরোধও জানালেন তিনি।

অতএব মহাপ্রভু গঙ্গাতীরের দিকে এগিয়ে চললেন। নিত্যানন্দ প্রভু আকস্মিক ভাবেই মহাপ্রভুর সামনে উপস্থিত হয়ে গঙ্গাকে দেখিয়ে বললেন প্রভু, এই তো সেই যমুনা।

মহাপ্রভু স্নান করলেন, গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞানে স্তব করলেন। ঠিক সেই সময় অদ্বৈতপ্রভু নৌকো নিয়ে অপর পার থেকে এলেন। প্রভুর পরনে একখানা কৌপীন ও বহির্ব্বাস। তাও স্নান করেছেন বলে ভিজে গিয়েছিল। অদ্বৈতপ্রভু সঙ্গে করে নূতন আর একখানা কৌপীন আর বহির্ব্বাস নিয়ে এসেছিলেন। সেই কৌপীন আর বহির্ব্বাসখানা মহাপ্রভুর দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন, এবং সমস্ত ব্যাপারটাই যে নিত্যানন্দের ছলনা তা'ও বুঝতে পারলেন। অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে মিনতি জানিয়ে বললেনঃ প্রভু, তুমি যেখানে, সেখানেই বৃন্দাবন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আরও বললেনঃ

"প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥
একমুষ্টি অন্ন মুঁই করিয়াছোঁ পাক।
শুকা-রুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক॥" —চৈঃ চঃ

অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে সঙ্গে করে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। আচার্য্য—পত্নী সীতাঠাকুরানী বহুযত্নে অনেক কিছু রেঁধেছিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু আহারে বসলেন—স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভু নিজে পরিবেষণ করলেন। তৎপর অপরাপর ভক্তগণ আহারে বসলেন।

সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হ'লো। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য করলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাবাসে দশদিন অবস্থান করলেন। নবদ্বীপ থেকে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এলেন।

মা ও ছেলে দু'জনে দু'জনের দেখা পেয়ে কাঁদলেন। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে ও অন্যান্য ভক্তদের সম্ভাষণ করে—মহাপ্রভু তাঁর মায়ের ইচ্ছানুসারেই নীলাচলের দিকে রওনা হ'লেন। নিত্যানন্দ প্রভু দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত ও মুকুন্দ পণ্ডিত চললেন মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে। ছত্রভোগের পথে তাঁরা নীলাচলের দিকে এগিয়ে চললেন।

নীলাচলের দিকে চলতে চলতে মহাপ্রভু রেমুনায় এসে উপস্থিত হ'লেন। রেমুনাতেই ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির। মহাপ্রভু মন্দিরে ঢুকে শ্রীবিগ্রহের সামনে যেই প্রণাম করলেন, অমনি গোপীনাথের মাথার ফুলের চূড়া তাঁর মাথায় খসে পড়ল। মহাপ্রভু প্রেমভাবে বিবশ হয়ে বহুক্ষণ কাঁদলেন, নাচলেন ও গাইলেন। গোপীনাথের সেবকগণও তাঁর দিব্যদেহ ও দিব্যভাব দেখে সেবা-যত্ন করলেন।

মাধবপুরী গোঁসাঞি একবার শান্তিপুর থেকে নীলাচলে যাওয়ার পথে একরাত্রি রেমুনায় অবস্থান করেছিলেন। লোকমুখে তিনি শুনেছিলেন যে, রেমুনার গোপীনাথের যে ভোগ হয়—তাঁর স্বাদ অতুলনীয়, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় গোপীনাথকে যে ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়—সেই ক্ষীরভোগের আস্বাদন অমৃততুল্য।

পুরী গোঁসাঞি ভাবলেন—গোপীনাথের ক্ষীরভোগের একটু আস্বাদন পেলে—তিনিও সেই ধরণের ক্ষীরভোগ বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত গোপালকে খাওয়াবেন। কিন্তু ক্ষীরপ্রসাদ ভোজনের ইচ্ছা তাঁর মনেই রয়ে গেল, গোপীনাথের পূজারীর কাছে তিনি সে কথা প্রকাশ করতে পারলেন না। রাত্রির পূজা-আরতির শেষে মন্দির বন্ধ হয়ে গেল। মাধবপুরী মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, এবং রেমুনা গ্রামে শূন্যহাটে বসে মৃদুস্বরে শ্রীভগবানের নামগান করতে লাগলেন।

এদিকে স্বয়ং গোপীনাথ মন্দিরের পূজারীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন: ওহে পূজারী, আমার ধড়ার আঁচলের নীচে একহাঁড়ি ক্ষীর রয়েছে—আমি ভোগের ক্ষীরের থেকে এই একহাঁড়ি ক্ষীর পুরী গোঁসাঞির জন্য সরিয়ে রেখেছি। পুরী গোঁসাঞি শূন্য হাটে বসে রয়েছেন, তুমি তাঁকে ঐ ক্ষীরের হাঁড়িটা দিয়ে এসো।

স্বপ্নে গোপীনাথের দর্শন পেয়ে পূজারীতো অবাক। তিনি মন্দির খুলে দেখলেন—শ্রীবিগ্রহের ধড়ার নীচে সত্যসত্যই একহাঁড়ি ক্ষীর রয়েছে। পূজারী ঐ ক্ষীরভাণ্ড নিয়ে হাটে গেলেন। পুরী গোঁসাঞির কাছে' স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে—তাঁর হাতে ক্ষীরভাণ্ডটি দিলেন।' পুরী গোঁসাঞি ক্ষীরভাণ্ডটি হাতে নিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। ভক্তের জন্য শ্রীভগবানকেও কিনা শেষ পর্য্যন্ত ক্ষীর চুরি করতে হ'ল। কিন্তু লোকখ্যাতির ভয়ে পরদিন ভোরেই, মাধবপুরী রেমুনা ত্যাগ করে নীলাচলের পথ ধরলেন। কিন্তু সেই থেকেই রেমুনার গোপীনাথের নাম হ'ল—ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।

রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥
* * * *
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥ —চৈঃ চঃ

রেমুনা থেকে মহাপ্রভু সঙ্গীগণ সহ পুরীধামের দিকে অগ্রসর হ'লেন। যাজপুরের বরাহমন্দির দর্শন করে তাঁরা কটকে গেলেন সাক্ষীগোপাল বিগ্রহ দর্শন করার জন্য। নিত্যানন্দ প্রভু একবার কটকে এসে সাক্ষীগোপালের কাহিনী শুনেছিলেন। মনের আনন্দে তিনি মহাপ্রভুর কাছে সেই কাহিনীই বললেন।

একবার বিদ্যানগর থেকে দুই ভক্ত ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে তীর্থ করতে। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ বয়োবৃদ্ধ ও কুল, মানে এবং অর্থকৌলিন্যে শ্রেষ্ঠ। অপরজন যুবক, তিনি ব্রাহ্মণ হলেও বংশমর্য্যাদা ও অর্থকৌলিন্যে বয়োবৃদ্ধ ঐ ব্রাহ্মণটির তুলনায় হীন। তীর্থে গিয়ে যুবা ব্রাহ্মণটি বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সেবা যত্ন করলেন। বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি যুবকের সেবা-যত্নে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'তোমার ওপর আমি খুব খুশী হয়েছি, তোমার সঙ্গেই আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনে যুবকটি বলল তা কি করে সম্ভব? আপনি কুল-মানে শ্রেষ্ঠ। আপনার তুলনায় আমি কত নগণ্য। আপনার আত্মীয় স্বজনই বা এ বিয়েতে রাজী হবেন কেন?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন: যে যাই বলুক। আমি তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীগোপাল বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়েই তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা উচ্চারণ করলেন।

তারপর দু'জন ব্রাহ্মণই দেশে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতিশ্রুতির কথা শুনে তার স্ত্রীপুত্রগণ রেগেই আগুন। কিছুতেই এ বিয়ে হতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের বিরোধিতা করতে সাহস পেলেন না বলেই—সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চুপ করে গেলেন।

কিছুদিন পরে ঐ ব্রাহ্মণ যুবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সে কথা শুনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রেরা যুবকটিকে মারতে তেড়ে এল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও অবস্থা বুঝে

যুবকটিকে বললেন ঃ তোমায় আমি ঐ ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি কি দিইনি সে কথা আমার মনে নেই। তবে তুমি যখন বলছ শ্রীগোপাল বিগ্রহের সামনে আমি তোমায় এ ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তিনি যদি স্বয়ং এসে এ ব্যাপারে তোমার হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন—তবে আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য।

যুবকটি কি আর করে তখন ? সে সোজা বৃন্দাবনে গিয়ে গোপাল বিগ্রহের সামনে প্রত্যাদেশ পাওয়ার জন্য হত্যা দিয়ে পড়ে রইল। তাঁর কাতর প্রার্থনায় শেষ পর্য্যন্ত গোপাল সাড়া দিয়ে বললেন—সাক্ষ্য দিতে আমি অবশ্যই বিদ্যানগরে যাব। তোমার পিছু পিছুই যাব আমি। কিন্তু আমার দিকে কখনই ফিরে তাকানো চলবে না। তুমি যেখানে আমার দিকে পিছু ফিরে তাকাবে, আমি সেখানেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ব কিন্তু।

গোপালের নির্দ্দেশ মেনে নিয়ে যুবকটি সন্তুষ্ট মনে বিদ্যানগরের দিকে রওনা হ'লেন। চলতে চলতেই শুনতে পেলেন তিনি—গোপালের চরণের নূপুর ধ্বনি। কিন্তু নিজের গ্রামের কাছাকাছি এসে যুবকটি ভাবল ঃ নূপুরের ধ্বনি তো শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ঠাকুর সত্যি সত্যি আসছেন তো !

এই ভেবে যেই যুবকটি পিছন-পানে ফিরে তাকাল—গোপাল সেই জায়গায় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যুবকটি ছুটে গিয়ে সব বৃত্তান্ত বলে গ্রামবাসীদের ডেকে আনল।

সাক্ষিগোপালের এই অদ্ভুত সাক্ষ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটিও সন্তুষ্ট হয়ে ঐ যুবকটির সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিলেন।

পরবর্ত্তীকালে উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম সেই বিগ্রহকে কটকে এনে স্থাপন করেন। সেই থেকে মহা সমারোহে গোপালের সেবা-পূজা চলতে লাগল। রাজমহিষীর একবার ইচ্ছা হ'লো সাক্ষীগোপাল বিগ্রহের নাসিকায় মুক্তো পরাবেন।

রাত্রে স্বয়ং গোপাল রাজমহিষীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন ঃ তুমি

আমার নাকে মুক্তো পরাতে চাওতো ? সেইজন্য নাক ফুটো করবার কোন প্রয়োজন নেই। শিশু বয়সে আমার মা মুক্তো পরাবার জন্য আমার নাক ফুটো করিয়েছিলেন। সেই ফুটো এখনও রয়ে গেছে। অতএব তুমি অনায়াসে মুক্তো পরাতে পার।

শ্রীগোপালের স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাণী মহা সমারোহে গোপালের নাসিকায় মুক্তো পরিয়ে দিলেন।

রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে ॥
বালক-কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥

—চৈঃ চঃ

[এ প্রসঙ্গে যারা মূর্ত্তিতে বিশ্বাসী নন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার নিবেদন ঃ—এমনিতে মাটির, পাথরের বা ধাতুর নির্ম্মিত মূর্ত্তি মূল্যহীন হ'লেও—ভক্তের ভালবাসায় বা শ্রদ্ধায় যখন ঐ মূর্ত্তিতে অব্যক্ত ও অব্যয় ঈশ্বর তাঁর অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে এসে ভক্তের কাছে ধরা দেন, তখনই ঐ মূর্ত্তি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। —গ্রন্থকার]

সাক্ষিগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করে মহাপ্রভু সঙ্গীগণ সহ পুরীধামের দিকে অগ্রসর হ'লেন। পথে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ডটি ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্য্যায়ের তাঁরাই দণ্ড ধারণ করেন, কিন্তু যারা হংস বা পরমহংস হ'ন তাদের দণ্ডধারণ করতে হয় না। মহাপ্রভুর দণ্ডধারণ নিত্যানন্দ প্রভুর ভালো লাগে নি—তাই তিনি দণ্ডটি ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আঠারনালার কাছে এসে মহাপ্রভু জানতে পারলেন যে, তাঁর দণ্ডটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তিনি রাগ করে সঙ্গীদের পরিত্যাগ ক'রে একাই জগন্নাথ মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন।

জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করে, তিনি ভাবাবেশে বিগ্রহকে আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটে গেলেন এবং মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর এই ধরণের ভাবাবেশ দর্শন করে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। লোকজন দিয়ে ধরাধরি করে তিনি মহাপ্রভুকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভু এবং অপরাপর সঙ্গীগণ জগন্নাথ মন্দিরে এসে মহাপ্রভুর খবর পেয়ে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের বাড়ী ছুটে গেলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের পর মহাপ্রভুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হ'লো। সার্ব্বভৌম তাঁদের সবাইকে মহাপ্রসাদ সেবা করিয়ে—তাঁর মাসীর বাড়ীতে সঙ্গীগণ সহ মহাপ্রভুর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রথমে মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন নি। মহাপ্রভু সাতদিন ধরে নীরবে সার্ব্বভৌমের বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনলেন। প্রভু একটিও কথা বললেন না দেখে, সার্ব্বভৌম তাঁর নীরবতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

মহাপ্রভু বিনীতভাবে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে বললেন: আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করেই আমি বেদান্ত শুনছি—কিন্তু ব্যাসদেবের বেদান্ত সূত্রগুলো আমি যত স্পষ্ট বুঝতে পারছি—আপনার ব্যাখ্যা তেমন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি না।

পরিশেষে মহাপ্রভু ও সার্ব্বভৌমের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচার সুরু হলো। সার্ব্বভৌমের প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু—শ্রীশঙ্করের মায়াবাদকে খণ্ডন করে বললেন: মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম নিরাকার ও শক্তিহীন কিন্তু বেদ-বেদান্তের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। আকারও রয়েছে—তবে সে আকার বা মূর্ত্তি প্রাকৃত নয়— অপ্রাকৃত এবং চিন্ময়।

সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটি শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করে শোনালেন। মহাপ্রভু বললেন…এই শ্লোকের আরও ব্যাখ্যা হতে পারে।

সার্ব্বভৌম তাঁর পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি দিয়ে মহাপ্রভুর বিচার করতে পারলেন না, শেষ পর্য্যন্ত মাথা নত করে মহাপ্রভুকে সনাতন

পুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি জানালেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর মধ্যে রাধাভাব সুবলিত শ্যামনাগরকে দেখে অবাক ও হতবাক হ'লেন।

আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥ —চৈ: চ:

মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে ধন্য হ'লেন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥ —চৈ: চ:

কিছুকাল নীলাচলে অবস্থান করার পর মহাপ্রভু পরিব্রাজকরূপে একক দক্ষিণ ভারতের দিকে যেতে চাইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে যেতে চাইলেন—কিন্তু মহাপ্রভু রাজী হ'লেন না। পরিশেষে ঠিক হলো কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ প্রভুর কৌপীন, বহির্ব্বাস আর জলপাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে যাবেন। জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করে মহাপ্রভু আলালনাথের পথ ধরে চললেন। সঙ্গে চলল কৃষ্ণদাস। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বলেছিলেন—বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা রামানন্দ রায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে।

মহাপ্রভু ভক্তদের কাঁদিয়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে এগিয়ে চললেন, সঙ্গে চলল কৃষ্ণদাস। মহাপ্রভু ভাবাবেশে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে চলতে লাগলেন। পথের লোক তাঁর দিব্যকান্তি দেখে আর হরিনাম শুনে মুগ্ধ হ'লো।

কূর্ম্মস্থানে গিয়ে তিনি কূর্ম্মবিগ্রহ দর্শন করে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করলেন। কূর্ম্ম নামে এক স্থানীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুর সেবাযত্ন করলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেবকে তিনি জড়িয়ে ধরে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করতে উপদেশ দিলেন।

নৃসিংহ ক্ষেত্রে গিয়ে মহাপ্রভু শ্রীবিগ্রহের স্তবস্তুতি করলেন। তারপরে প্রভু গোদাবরী তীরে এলেন। গোদাবরী তীরেই রায়

রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হ'লো। রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। সাধ্য—সাধন তত্ত্বের বহুতর আলোচনা হ'লো রায় রামানন্দের সঙ্গে।

রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥ —চৈঃ চঃ

শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের আলোচনার শেষ কথা হ'লো—'প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত, প্রেমের চরম পরিণতি। শ্রীরাধা কৃষ্ণের মধুর লীলারস আস্বাদনের একমাত্র অধিকার সখীদের। তাঁদের অনুগত হয়ে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করলেই—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যমণ্ডিত নিত্যলীলায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। শ্রীরাধা হ'লেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের কল্পলতা—আর সখীরা হ'লেন সেই কল্পলতার পুষ্প পল্লব। সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র দয়িত। এই হ'লো ব্রজের সবচেয়ে মধুর ভাব। বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে যিনি রাগানুগা মার্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন—তিনিই কেবল এই রসানুভবের অধিকারী।

দশদিন রায় রামানন্দের সান্নিধ্যে যাপন করে মহাপ্রভু আরও দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চললেন। বিদায়কালীন মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে পুরুষোত্তমে চলে যাবার নির্দ্দেশ দিলেন।

বিদ্যানগর থেকে যাত্রা করে মহাপ্রভু ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। শত শত তীর্থ পরিদর্শন করে তিনি ধনুতীর্থে স্নান করে রামেশ্বর দর্শন করলেন। রঙ্গনাথে গিয়ে বেঙ্কট ভট্ট নামে এক বৈষ্ণবগৃহে মহাপ্রভু চারমাস (চতুর্ম্মাস্য ব্রত) অবস্থান করলেন। বহু স্থানীয় লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মধ্বাচার্য্য-স্থাপিত কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করে মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবদের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়ে দিলেন।

তৎপরে পাণ্ডবপুর নামক স্থানে এসে মহাপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। শ্রীরঙ্গপুরীর কাছ থেকেই কথা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু জানতে পারলেন যে, তাঁর দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে শঙ্করাণ্য নাম ধারণ করেছিলেন।

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালেই মহাপ্রভু 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক দু'খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।—এবং ঐ দু'খানি গ্রন্থ নিয়ে বিদ্যানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিদ্যানগরে সাতদিন অবস্থান করার পর—তিনি পুনরায় পুরুষোত্তম ধামের দিকে রওনা হ'লেন। রায় রামানন্দও তাঁর অনুসরণ করলেন। পুরীতেই মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ আচার্য্যের পুনরায় সাক্ষাৎ হলো। নীলাচল আবার প্রেমের বন্যায় উথলে উঠল।

মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করছিলেন—তখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের মহাপ্রভু সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দিব্য সান্নিধ্য লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়েন।

নবদ্বীপ থেকে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে কাশীধামে গিয়েছিলেন। তিনি স্বরূপ নাম ধারণ করে নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর চরণে শরণ নিলেন। তিনি রসশাস্ত্রে ও ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত—মহাপ্রভু তাঁর নূতন নাম-করণ করলেন—স্বরূপ দামোদর। সমুদ্রে যেমন নানা নদ-নদী এসে মিলিত হয়, পুরীধামেও নানা দেশ থেকে অসংখ্য ভক্ত মহাপ্রভুর দিব্যসান্নিধ্য লাভের জন্যে ছুটে এলেন।

এদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হ'লেন। কিন্তু মহাপ্রভু রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন না।

রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু সাতদিন গুণ্ডিচা মন্দিরে কাটান। মহাপ্রভু ভক্তদের সহায়তায় গুণ্ডিচা মন্দির ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করেন।

নবদ্বীপ থেকে অদ্বৈত, হরিদাস প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণও মহাপ্রভুর

সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পুরীধামে চলে এলেন। রথযাত্রার দিন মহা সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হ'লো।

বলগণ্ডিতে ভোগ লাগাবার সময়ে উদ্যানের অভ্যন্তরে মহাপ্রভু একদিন ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজা প্রতাপরুদ্র দীন বৈষ্ণবের বেশে উদ্যানে প্রবেশ করে, মহাপ্রভুর চরণ সেবা করতে থাকেন। মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থার শেষে রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন।

এই মত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে .
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণব বেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা নৈল যোড়হাত হৈয়া।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
"বোল-বোল' বুলি উচ্চ বোলে বারবার॥
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন কৈল॥

এদিকে ভোগ শেষে জগন্নাথ দেবের রথ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শত চেষ্টাতেও রথ সহস্র সহস্র লোক চালাতে পারল না, মহাপ্রভু তখন নিজের মাথা দিয়ে ঠেলে জগন্নাথ দেবের রথ চালালেন।

গুণ্ডিচার নিকটে আইটোটায় মহাপ্রভুর বাসের ব্যবস্থা করা হ'ল। হোরা পঞ্চমীর দিনে মহাপ্রভু নেচে-গেয়ে আনন্দ করলেন। স্বরূপের সঙ্গে শ্রীরাধা তথা গোপীপ্রেমের মাধুর্য্য নিয়ে ভাবাবেশে আলোচনা করলেন। উল্টোরথের দিনেও আবার মহাসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হ'লো।

রথযাত্রা উৎসব সমাপ্তির পর নবদ্বীপের ভক্তগণ বিদায় নিয়ে চলে

গেলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসের হাতে মায়ের জন্য মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র অর্পণ করলেন।

দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে নীলাচলে চার বছর অবস্থান করার পর মহাপ্রভু স্বল্পকালের জন্য আবার বাংলাদেশে এসেছিলেন, শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে আবার শচীমাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মহাপ্রভুর দিব্য সান্নিধ্য লাভ করে তথাকার বৈষ্ণব ভক্তগণও উল্লসিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু মহাপ্রভু দীর্ঘদিন শান্তিপুরে অতিবাহিত করেন নি, পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবং নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করার অল্পদিন পরেই তিনি শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বৃন্দাবন যাত্রাপথে তিনি রাজপথ পরিত্যাগ করে কটকের বাম পার্শ্বস্থ ঝারিখণ্ডের অরণ্য পথ দিয়ে চলতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রিয় অনুচর বলভদ্র এবং আর এক ব্রাহ্মণ।

মহাপ্রভুর এই যাত্রা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই ঘটনা বহুল। যে অরণ্য পথ দিয়ে মহাপ্রভু চলছিলেন—সে পথ বর্বর আদিম মনুষ্য জাতি এবং হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত। ঘন জঙ্গল, পথ নেই বললেই চলে। কোথায়ও সরু পায়ে চলার পথ। যে পথ দিয়ে বাঘ, ভালুক ও বুনো হাতীরা চলাচল করে। ধারে কাছে কোথায়ও মানুষের বসতি নেই বললেই চলে। কিন্তু পথের অসুবিধা এবং বিপদ—মহাপ্রভুর চলার উৎসাহকে কিছুমাত্র অবদমিত করতে সমর্থ হয়নি। তাঁর মুখ নিঃসৃত হরিনাম ধ্বনি অরণ্যের হিংস্র জন্তুদের মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল যেন। তারা মহাপ্রভুর চলায় বাধাতো দিলই না—বরং তাঁর চলার পথ ছেড়ে দিয়ে—অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিব্যকান্তি দর্শন করছিল যেন। বন্য শূয়ার, হিংস্র বাঘ, বনহস্তী, ভালুক ইত্যাদি পশুরা তাঁদের স্বাভাবিক আচরণ যে হিংস্রতা—সেই হিংস্র আচরণ পরিত্যাগ করে—স্বীয় নাম কীর্ত্তনকারী হরিকেই দর্শন করছিল। বলভদ্র এসব দেখে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু ভাবাবেশে হেঁটে চলেছেন—এক নিদ্রামগ্ন বাঘের ঘুম মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ভেঙ্গে গেল।

মহাপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলে ডেকে উঠলেন। নিদ্রোত্থিত ব্যাঘ্রও তাঁর দিব্যকান্তি দেখে এবং কৃষ্ণনাম শুনে হিংস্রতা পরিহার করে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

একবার মহাপ্রভু যখন নদীতে স্নান করছিলেন—একদল মত্তহাতী সেখানেই জল পান করতে এল। মহাপ্রভু তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বল।' হাতীর দল উচ্চ বৃংহতি ধ্বনির মাধ্যমে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে—মহানন্দে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। এসব দৃশ্য দেখে মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্রের বাকরুদ্ধ হ'য়ে গেল।

অরণ্য পথ ধরে চলতে চলতে মহাপ্রভু যখন ভাবাবেশে কৃষ্ণের নাম গান করতেন, বনের হরিণেরা ছুটে আসত, আসত তাদের পিছু পিছু বাঘেরাও। কিন্তু খাদ্য-খাদক সম্পর্ক তারা বিস্মৃত হয়ে নির্ভয়ে মহাপ্রভুর দিব্যকান্তি দর্শন করত। মহাপ্রভুর কণ্ঠে নাম গান শুনে বনের ময়ুর-ময়ূরী পেখম মেলে নাচত। বনের তরুলতা মহাপ্রভুর নাম গান শুনে আনন্দে আন্দোলিত হ'তো।

অরণ্য-পথ শেষে মহাপ্রভু যখন আবার জনপদে উপনীত হ'তেন, —দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও শর্করাদি খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানকার লোক মহাপ্রভুকে অর্ঘ্যরূপে দান করত। কারো কাছে কিছুই চাইতে হ'তো না মহাপ্রভুকে।

এভাবে বহু অরণ্য ও জনপদ অতিক্রম করে মহাপ্রভু বারাণসী-ধামে উপনীত হ'লেন। বারাণসী-ধামের অনেকেই মহাপ্রভুর দিব্য সান্নিধ্য এবং উপদেশের প্রভাবে—তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভু বারাণসী থেকে যাত্রা করে প্রয়াগে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে মথুরাপুরীতে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবাদি লীলাস্থল পরিদর্শন করতে করতে রাধাভাব সুবলিত শ্যামনাগর অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই অস্থিরতার মধ্যে লীলাস্থল দর্শনজাত দিব্য আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের

নিত্য লীলাস্থলসমূহ পরম আগ্রহভরে দর্শন করেন। চুরাশি-ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিদর্শনের সময় মহাপ্রভু পুরাণোক্ত সকল স্থানই দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেমবিলাস স্মৃতি-মণ্ডিত এই বৃন্দাবন—যেখানকার ভূমি চিন্তামণিময়, জল অমৃত, তরু মানেই কল্পতরু। সেই বৃন্দাবনের মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন. কাম্যবন, খদিরবন, বৃন্দাবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, লৌহবন, বিল্ববন ও মহাবন—এই দ্বাদশ বন পরিভ্রমণের সময় মহাপ্রভু আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। বৃন্দাবনও মহাপ্রভুর সান্নিধ্যলাভে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেই ফিরে পেয়ে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ময়ুর-ময়ূরী পাখা মেলে নাচতে লাগল। পুষ্পসকল বৃন্তচ্যুত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মহাপ্রভুর রাতুল চরণে পতিত হয়ে আনন্দ-অভিনন্দন জানাল। অনেককাল পরে বৃন্দাবন যেন আবার জেগে উঠল। চৈতন্যচরিতামৃতের রূপকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখলেন—কোটি কোটি গ্রন্থের মাধ্যমেও এ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে উড়িষ্যা প্রত্যাবর্তনকালে যথাক্রমে প্রয়াগ ও বারণসীধামে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সঙ্গে ভাগবত ধর্ম আলোচনা করেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ, ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন ও ভক্তি সদাচার প্রচারের জন্য মহাপ্রভু রূপ ও সনাতনের ওপর ভার অর্পণ করেন। বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়নের ভারও মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের ওপর অর্পণ করেন।

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব —
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ —শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

কালক্রমে বৃন্দাবনের লীলারসের কথা বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে

গেলেও—আবার তা বিশেষভাবে প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনেই রূপ-সনাতনকে কৃপার অমৃত দিয়ে অভিষিক্ত করলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশেই শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনে বসবাস করে—লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন এবং ভক্তিগ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন।

বারাণসী থেকে মহাপ্রভু পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আঠারো বৎসর যাবৎ তথায় অবস্থান ক'রে অন্তর্হিত হন।

আঠারো বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর তিনি ভক্তগণ সঙ্গে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে কাটান। শেষ দ্বাদশ বৎসরকাল শ্রীস্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত আস্বাদন করে দিব্যানন্দে বিভোর হয়ে কাটান। কখনও মিলনের আনন্দ, কখনও কৃষ্ণবিরহের দুঃখে উদ্বেল হয়ে উঠতেন তিনি।

চৈতন্য চরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যার মন ধীর।। —চৈঃ চঃ

গম্ভীরার প্রকোষ্ঠে অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সহ মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলামৃত আস্বাদন করতেন। মহাপ্রভু যতদিন পুরীধামে ছিলেন—বাংলাদেশ থেকে প্রতিবৎসরই অসংখ্য ভক্তগণ তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসতেন। মহাপ্রভু তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হ'তেন। কিন্তু শেষ দ্বাদশ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তিনি প্রেমাবেশে আবিষ্ট হয়ে থাকতেন, বাহ্যজ্ঞানও থাকত না তাঁর। কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন—কখনও ভাবাবেশে বিভোব হয়ে নাচছেন। ভাগবত বা পুরাণে উল্লিখিত প্রসঙ্গসমূহ নিরন্তর চিন্তা করতেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস তাঁর দিনমানের চিন্তা, আর রাত্রির স্বপ্ন। যেদিকে নয়নের দৃষ্টি পড়ত—সেদিকেই কৃষ্ণ। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—জগৎমোহন সেই কৃষ্ণ, প্রাণবল্লভ সেই কৃষ্ণ। রাধাভাবের আবেশে ক্রমশঃই বিবশ হয়ে পড়তে লাগলেন মহাপ্রভু। জলাশয় দেখতে পেলেই যমুনা বলে ভাবতেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে

ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথবা যমুনায় জলকেলি করছেন,—আবার ব্রজ-গোপীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নৃত্য করছেন। তাঁর মুরলীধ্বনি শুনে অকাশের মেঘ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর এরূপ বাহ্য-চৈতন্য লোপের অবস্থাকে—শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী পূর্ণ-চৈতন্যাবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের ধ্যানে মগ্ন মহাপ্রভু ভাবাবেশে সমুদ্রকে যমুনা ভ্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

শরৎকালের জ্যোৎস্নায় সমুদ্র দেখে তিনি যমুনা বলে ভ্রম করেছিলেন। দৌড়ে এসে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সারারাত সমুদ্রের জলে মূর্ছিত হয়ে ডুবে রইলেন তিনি। প্রভাতে তাঁর ভক্তগণ তাঁকে খুঁজে পেলেন।

প্রভাতে ভক্তগণ তাঁকে কিভাবে খুঁজে পেলেন জানেন ?

ভাবাবেশে যখন মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং মূর্ছিত অবস্থায় ডুবে রইলেন, তাঁর সেই অচেতন দেহ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে এবং স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে জেলেরা কোণারকের সন্নিকটে সমুদ্রতীরে মাছ ধরছিল। একজন জেলের জালে মহাপ্রভুর দিব্যদেহ আটক পড়ল।

'বড় মৎস বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে॥ —চৈঃ চঃ

জেলে ভাবল একটা বড় মাছই বুঝি তার জালে আটকা পড়েছে। কিন্তু অনেক যত্নে তীরে তুলে আব্‌ছা আলোয় জেলে দেখতে পেল—বড় মাছের পরিবর্তে মৃত্যু-শীতল এক দিব্যদেহ। অচেতন দেহ যেন ভাবাবেশে বিবশ। প্রাণহীন দেহ থেকে ক্ষীণকণ্ঠস্বর নির্গত হ'তে লাগল। অশিক্ষিত জেলের মনে ভূতের ভয় জেগে উঠল। ঐ মৃত-দেহের অভ্যন্তর থেকে নিশ্চয়ই প্রেতাত্মা ক্ষীণস্বরে কথা বলছে। জেলে কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। একদিকে ভূতের ভয়, আর এক দিকে দিব্যদেহের আকর্ষণ। ঐ অবস্থায় জেলে অস্থির ভাবে সমুদ্রের বেলাভূমিতে উন্মত্তপ্রায় অবস্থায় ছুটোছুটি করতে লাগল। রাত ভোর হয়ে এল। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে উপনীত হ'লেন। গত সন্ধ্যা থেকেই তাঁরা দু'জন মহাপ্রভুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। জেলে তাঁদের কাছে আনুপূর্বিক সব ঘটনা বলল। জেলে যাকে ভূত ভেবে বেলাভূমিতে

শুইয়ে রেখেছে—তিনি কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে বিবশ স্বয়ং মহাপ্রভু। স্বরূপ দামোদর আর রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সেই বিবশ দেহের পাশে বসে হরিনাম কীর্তন করতে লাগলেন। নামের প্রভাবেই ভাব-বিহ্বল দেহ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

"তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে স্নান করাঞা।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥" —চৈঃ চঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে তিনটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে :—

প্রথম : শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে আর বাইরে বেরিয়ে আসেননি—শ্রীবিগ্রহের সঙ্গেই লীন হয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় : তিনি টোটা গোপীনাথের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। অর্থাৎ—টোটা গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে লীন হয়ে গেছেন।

তৃতীয় : তিনি সমুদ্রের ধার থেকে সহসা অন্তর্হিত হয়েছেন।

উপরোক্ত তিনটি কিংবদন্তীকেই আমি একই সঙ্গে সত্য বলে মনে করি। মহাপ্রভুর দেহ মানুষের মতো প্রতীত হ'লেও—সে দেহ প্রাকৃত নয়। অতএব অন্তর্ধানের সময়ে—একই সঙ্গে তিনি জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে, টোটা গোপীনাথের মন্দিরে এবং সমুদ্রতীরস্থিত ভক্ত-জনকে দর্শন দান করে—তিরোভাব লীলা প্রকাশ করেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাসের উক্তিই এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বলে মনে করি :

"অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত॥
লুকাও আপনে তুমি প্রকাশ আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর জানে সেই জনে॥"

শ্রীভগবানের লীলা বিলাস—সেই তাঁরই অচিন্ত্য তর্কাতীত শক্তিরই ফলশ্রুতি! সাধারণ জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে শ্রীভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য বিচার করা অসম্ভব।

—সমাপ্ত—